কানের দুল

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

দেড় টাকা

প্রকাশক:—
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
২০১,
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার-শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মানসী প্রেস
১৪।এ, রামতনু বসুর লেন,

তোমারই উদ্দেশে

এই গল্পগুলি 'মানসী' 'ভারতবর্ষ' ও 'আগমনী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রদ্ধেয় বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় মুদ্রণকালে গল্পগুলি দেখিয়া দিয়াছেন এজন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

কানের দুল

অমল এবং শিশির একদিন দুপুরবেলায় মহা তর্ক বাধাইয়া দিয়াছে। বর্ষাকালের আকাশ মেঘভারে অবনত, বাতাসে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতেছিল। অমল চেয়ারে পা উঠাইয়া বেশ আরাম করিয়া বসিয়া ছিল এবং একখানা চাদর দিয়া শরীরের নিম্নার্দ্ধ ঢাকিয়া দিয়াছিল। শিশির একটু দূরে একখানি আরাম কেদারায় শুইয়া একটী চুরুট লইয়া হাতে নাড়াচাড়া করিতেছিল। তাহার অগ্নি বহুক্ষণ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। অমল আর একখানি চাদর টানিয়া, শিশিরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "ভাল করে' পা-টা ঢেকে বেশ আরাম করে' বস না।"

শিশির তখন তর্কের নেশায় কিছু অন্যমনস্ক ছিল, বলিল, "নাঃ —একটা বিষয় ভেবে দেখ, ওকালতীতেও যথেষ্ট পরাধীনতা আছে। তবে সে দশ জনের অধীনতা, আর চাকরীতে একজন কি বড় জোর দু'জনের অধীনতা। দুই-ই সমান ঝকমারি!"

অমল বলিল, "তা আর নয়! চাকরীতে প্যাঁচ-পয়জারের অন্ত নেই। ওকালতীতে তোমার যেমন ইচ্ছে, তেমনই চল। কারও সাধ্যি নেই যে তোমায় একটী কথা বলে!"

শিশির। আচ্ছা উকীল হও, তখন দেখে নিও।

অমল। বেশ, দেখে নিও!

এইরূপ ভাবেই তর্ক চলিতেছিল। শিশির দেখিল, তর্কের গতিটা বেশ দ্রুত হইলেও, মীমাংসার দিকে বড় অগ্রসর হইতেছে না। তখন সে কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, একবার অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যস্থিত নির্ব্বাপিত চুরুটের দিকে দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু তাহার মধ্যেও সে মীমাংসার ক্ষীণ সূত্রটির কোনও আভাস পাইল না। তখন বলিল, "দেখ অমল, তুমি চিরকালই কিছু তর্কপটু। এ পর্য্যন্ত মনে পড়ে না, যে তর্কের দ্বারা তোমাকে কোনও জিনিস বোঝাতে পেরেছি!"

অমল বলিল, "সেটা আমার দোষ নয়। কুতর্কের প্রধান দোষই এই।—এবং সে জিনিসটি তোমার বরাবরই খুব অভ্যস্ত।"

শিশির এইবার রাগিল; বলিল, "তোমার ঐ আর একটি ব্রহ্মাস্ত্র। নিজে যখন তর্কে পেরে ওঠ না, তখন বাক্যযন্ত্রণায় অস্থির করে' তোলো। এটা বড় অন্যায়।"

অমল বলিল, "তুমি এই গোটা কয়েক কথা যা বল্লে, তার মধ্যে কতগুলি বিষয় ধরে' নিলে, হিসাব আছে কি? তোমার সঙ্গে তর্কে পেরে উঠি না, বেশ বেমালুম বলে' গেলে; কিন্তু ঐ খানেই ত একটা মস্ত সত্যের অপলাপ করলে!"

শিশির হস্তস্থিত চুরুটটি মেঝেয় ফেলিয়া দিল এবং আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল; একটি গলা খোলা কোটের ভিতরের পকেট হইতে একখানি রুমাল বাহির করিয়া সযত্নে চসমা খানি সাফ করিয়া লইল। তার পরে খুব ঋজুভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, "তোমার আর

আশা নেই। তুমি উকিল হওগে, বেশ পসার জমাতে পারবে। আমি চল্লুম।"

শিশির ঘরের বাহির হইয়া গেল। অমল চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

অমল এবং শিশির একই রায়পরিবারের ছেলে, কলেজে তাহারা সমপাঠী, এবং বাল্যকাল হইতেই বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। অমলের পিতা বাদুড়বাগানে স্বতন্ত্র বাড়ী করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে সমগ্র রায়পরিবার কাঁশারীপাড়ার বাড়ীতে বাস করিতেন; শিশির এখনও সেখানেই থাকে। হেয়ার স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে আসিয়া উভয়ে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হয়। তারপর হইতে ক্রমেই তাহাদের সখ্য নিবিড় হইয়া উঠে। উভয়েরই এক রকম চাল, একই রকম মত ও একই রকম খেয়াল। পরীক্ষাতেও উভয়ে খুব কাছাকাছি থাকিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত পরীক্ষাগুলিই উভয়ে একই রকম কৃতিত্বের সহিত একে একে পাশ করিয়াছে।

এখন বিচার হইতেছে, জীবনের বৃত্তি অবলম্বন লইয়া। অমলের ঝোঁক ওকালতীর দিকে। শিশির যদিও ওকালতী পাশ করিয়াছিল, তবুও উকীল হইতে তাহার বড় একটা ইচ্ছা ছিল না। অমলের সহিত তর্ক করিয়া সে বুঝিল, যে তাহার মত ঠিক হইয়া গিয়াছে; তাহাকে আর নড়াইবার যো নাই। তখন সেও ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইল—শেষটা ওকালতীই করিতে হইবে বোধ হয়। কারণ অমলকে ছাড়িয়া অন্য দিকে যাওয়া কি যায়?

রাস্তায় আসিয়া শিশির একবার আকাশের দিকে চাহিয়া পকেটে হাত দিল, দেখিল সম্বল কিছুই নাই। তখন আবার ফিরিল এবং অমলের মাতার নিকট গিয়া বলিল, "কাকী মা, গোটা কতক পয়সা দাও ত?"

অমলের মাতা বলিলেন, "কেন রে, এত শীগ্‌গির চল্লি যে আজ?"

শিশির সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, "মনে করেছিলুম হেঁটে পাড়ি দেব। কিন্তু জল আস্‌ছে। ট্রামে যেতে হল।"

অমলের মাতা কিছু পয়সা দিলেন। শিশির সেগুলি বাম হাতে লইয়া অবলীলা ক্রমে পকেটে ছাড়িয়া দিল এবং যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদি নেই, কেমন চল্‌ছে কাকীমা?"

কাকীমা একটু উচ্চস্বরে উত্তর দিলেন, "অমনি এক রকম। বৌ আছে ত ভাল?"

শিশির জবাব দিবার পূর্ব্বে দরজা পার হইয়া গিয়াছিল।

একদিন মধ্যাহ্নে হঠাৎ অমলচন্দ্র কাঁসারীপাড়ায় শিশিরের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। নীচে চাকরদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে শিশির বাহির হইয়া গিয়াছে। তখন সে একটু বিমর্ষ ভাবে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল এবং একেবারে শিশিরের মাতার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। শিশিরের মাতা বলিলেন, "হ্যাঁরে অম্‌লা, এই দুপুর বেলায় কোথায় চলেছিস্‌? শিশির এই খানিক আগে বেরিয়ে গেল যে।"

অমল বলিল "জেঠাইমা, আজ একটু বহরমপুর যাচ্চি,

মেজ-মাসীমার মেয়ের বিয়ে যে। তিনি একেবারে নাছোড় হ'য়ে ধরেছেন। শিশির এখনি আস্‌বে ত ?"

শিশিরের মা বলিলেন, "ও মা গো—এই দুপুর রোদে বহরমপুর যেতে হবে! ঘেমে যে সারা হয়ে যাবি। শিশির কখন আসবে কি করে বল্‌ব, বাবা? সে ব্যাঙ্কে গেছে। ও বৌমা, অমল এসেছে; ও বহরমপুর যাচ্ছে; গোটা কতক পান ওকে দিয়ে দাও না, পথে খেতে খেতে যাবে এখন।"

অমল বলিল, "হ্যাঁ তা পান গোটা কতক পেলে মন্দ হয় না। পথে খেতে খেতে তোমাদের মনে কর্‌ব এখন।"

অমলের কথা শুনিয়া শিশিরের মাতা হাসিলেন, পাশের ঘরে শিশিরের স্ত্রীও হাসিলেন। অমলকে ঘড়ি বাহির করিতে দেখিয়া শিশিরের মাতা বুঝিলেন যে গাড়ীর বড় বেশী দেরী নাই, তিনি নিজে উঠিয়া পান আনিবার জন্য অন্য ঘরে গেলেন। অমল শিশিরের পড়িবার ঘরে আসিয়া বসিল। তখন তাহার মনে হইল যে একখানা নভেল-টভেল গোছের বই সঙ্গে লইলে পথে সময়টা বেশ কাটিবে। এই মনে করিয়া সে এ বইখানা ও বইখানা টানিয়া দেখিতে লাগিল। একখানি বই র‍্যাকের উপর ছিল; বইখানা বেশ নূতন চক্‌চকে দেখিয়া অমল সেখানি পাড়িল। বইয়ের পাতা খুলিতেই অমল একখানি চিঠি পাইল; দেখিল, তাহার নিজের স্ত্রীর হস্তাক্ষর। কাশী হইতে তাহার স্ত্রী শিশিরকে পত্র লিখিয়াছেন। অমলের শ্বশুর কাশীতে থাকেন, সেখানে কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার কন্যাকে লইয়া গিয়াছেন।

অমল সরল বিশ্বাসে চিঠিখানি খুলিয়াছিল; সে অনেকদিন স্ত্রীর চিঠি পায় নাই। আজ শিশিরের নামীয় চিঠিতে মুরলার সংবাদ পাইয়া যাইতে পারিবে, এই আনন্দে তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু চিঠিখানা খুলিয়াই তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে আদ্যোপান্ত চিঠিখানা পড়িল—

জীবন সর্ব্বস্ব আমার,

তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ? আজ ক'দিন চিঠি লিখিতে পারি নাই; বৌদিদির জ্বালায়। তাঁহাকে লুকাইয়া চিঠি লেখা বড়ই কঠিন। তিনি আমার সমস্ত চিঠি দেখেন, সে জন্য আমার বড় লজ্জা করে। তুমি তা বলে যেন আমাকে চিঠি লিখিতে বিলম্ব করিও না! তাহলে আমি বড় কষ্ট বোধ করিব। আমি লুকাইয়া তোমার চিঠি পড়িব—এবং দিবানিশি বক্ষে করিয়া রাখিব। তুমি সে জন্য ভাবিও না। একদিন এক মুহূর্ত্ত যাহাকে চোখের আড়াল করিতে প্রাণ চাহে না, তাহাকে ছাড়িয়া আসিয়া যে কি সুখে আছি, তাহা তুমি কি বুঝিবে? যেখানে যাই তোমারই মুখখানি মনে পড়ে; কাজ কর্ম্ম সারিয়া যখন একটু বসি, তখন তোমারই চিন্তায় হৃদয় ভরিয়া যায়। কিন্তু তুমি আমার কথা মনে করিয়া থাক? তুমি আমাকে একটুও ভালবাস—সেই কথাটি শুনিবার জন্য আমার প্রাণ কত ব্যাকুল হয়! দূরে আসিয়াছি বলিয়া এ দাসীকে ভুলিও না।

একটী কথা তোমাকে বলিতে বড় সঙ্কোচ বোধ করিতেছি।

কিন্তু বড় সাধ হইয়াছে, তাই সেটি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিও। তোমার নিকট হইতে একটি প্রণয় উপহার পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। আমাদের পাড়ায় সে দিন এক সাহেব ও মেম বেড়াইতে আসিয়াছিল। মেমের কানে দুটি দুল এমন সুন্দর মানাইয়াছিল, সে আর কি বলিব! দুখানা চুনীর দুল; এমন সুন্দর গড়েছে যেন দু'ফোঁটা রক্ত কানের নীচে দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। অবশ্য মেমের রঙের জন্য আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল, আমরা তেমন রঙ কোথায় পাব? কিন্তু তা বলে কি আর আমাদের একটা ভাল জিনিস পরতে নেই? তোমার যদি ভাল মনে হয়, তবে আমাকে সেই রকম দু'টি দুল পাঠিয়ে দিও। লজ্জা পরিত্যাগ করে লিখ্‌লাম, কিছু মনে কোরো না।

আজ আর বেশী কিছু লিখিতে পারিলাম না। বড়-বৌদি এদিকে আসিতেছেন। আজ তবে বিদায়, আমার প্রাণের ভালবাসা গ্রহণ কর ইতি।

তোমারই মুরলা।

অমলের মাথা ঘুরিতেছিল। কেহ যদি সে সময় তাহার হস্ত স্পর্শ করিত, তবে সে দেখিত হাতখানি অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা ও স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। চিঠির অক্ষরগুলি তাহার চোখের তারকা যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। এই সেই মুরলা? রমণীর প্রেমে কি দেবতার অভিশাপ আছে? এত প্রেম—সব প্রতারণা? যেখানে অপরিমেয় বিশ্বাস, সেই খানেই কি নারীর প্রেম কালকুটে ভরা!

এমনই সব চিন্তায় অমলের মস্তিষ্ক আলোড়িত, বিধ্বস্ত হইতেছিল। সমস্ত বিশ্ব তাহার চোখে অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। সে বসিয়া পড়িল। ভাবিল শিশির আমার বাল্যবন্ধু—হায় বন্ধু! জগতের ধারাই কি এই?

কঙ্কণের শব্দে অমলকে চমকিত করিয়া, শিশিরের স্ত্রী আসিল এবং একখানি কলার পাতায় মুড়িয়া কতকগুলি পান অমলকে দিল; আর জিজ্ঞাসা করিল,—

"বহরমপুর থেকে কবে আস্‌বেন?"

তখন অমলের চিত্ত রাগে অভিমানে, ঈর্ষায় পুড়িয়া যাইতে ছিল। সে শিশিরের স্ত্রীর কথার কোন উত্তর দিল না। শিশিরের স্ত্রী অমলের মুখের দিকে এইবার চাহিল, চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল, বলিল,

"আপনার কি কোন অসুখ বোধ হচ্ছে? বহরমপুর না গেলে হয় না?"

সংক্ষেপে "নাঃ" বলিয়া অমল বেগে উঠিল। শিশিরের স্ত্রী তাহার সম্মুখে পানগুলি ধরিতেই, সে তাহা যেন কাড়িয়া লইল ও একটিও কথা না বলিয়া সিঁড়ি দিয়া ছুটিয়া নামিয়া গেল।

হঠাৎ গৃহের মধ্যে হস্তস্থিত কাঁসার বাসন স্খলিত হইলে তাহার ঝন্ ঝন্ শব্দে যেমন ঘরের সমস্ত বাসনপত্র কাঁপিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিতে থাকে, অমলের এই আকস্মিক ব্যবহারে, সে চলিয়া যাইবার পরও যেন সে ঘরের জিনিসও আসবাবপত্র কাঁপিয়া ফুকারিয়া উঠিল। শিশিরের স্ত্রী ইন্দিরা এরূপ ব্যবহারে

কখনও অভ্যস্ত নয়। অমলের এরূপ মূর্ত্তি সে আর কখনও দেখে নাই। বিবাহের পর হইতে সে অমলের সম্মুখে আসে, তাহার হাস্য পরিহাস কৌতুকে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করে—কিন্তু একি হইল! এমন ত কখনও সে প্রত্যাশা করে নাই। আস্তে আস্তে সে অমলের পরিত্যক্ত চেয়ারে বসিয়া পড়িল ও ললাটের অলকদাম অযত্নে সরাইয়া এ ব্যাপারের একটা সন্তোষজনক কারণ খুঁজিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল।

টেবিলের উপর কতকগুলি বই ছিল। দুপ'রের আগে সেগুলিকে সে যত্ন পূর্ব্বক সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল। তাহার মাঝখানে যে আর একখানি বই হঠাৎ আসিয়া তাহার স্বহস্ত-সৃষ্ট শৃঙ্খলাকে ভাঙ্গিয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা তাহার দৃষ্টি এড়াইল না। সে বইখানি টানিয়া লইতেই তাহার দৃষ্টি পড়িল মুরলার চিঠির দিকে। চিঠিখানি সে তুলিয়া লইল ও পাঠ করিল। সে মনে করিল, অমল তাহার স্ত্রীর চিঠিখানি আনিয়া ভুল করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা যেন হইল, অমল অমন করিয়া উল্কার মত সমস্ত গৃহের উপর একটা অজ্ঞাত অশান্তির ছায়াপাত করিয়া চলিয়া গেল কেন? এই চিন্তায় তাহাকে বারংবার পীড়া দিতে লাগিল। চিঠিখানি নিকটেই পড়িয়া ছিল, সে অন্যমনস্ক ভাবে খামের মধ্যে চিঠিখানিকে যত্নে মুড়িয়া পুরিল। এতক্ষণ সে খামের দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করে নাই। তাহার চিন্তা ছিল এক সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত। চিঠিখানিকে এমন ভাবে ফেলিয়া রাখা উচিত নহে ভাবিয়া, সে উঠিয়া নিজের ঘরে গেল

এবং আঁচল ফিরাইয়া চাবির গুচ্ছ হাতে লইয়া তোরঙ্গটি খুলিল। এইবার যেমন সে চিঠিখানি রাখিয়া দিবে, অমনি তাহার দৃষ্টি শিরোনামার উপর পড়িতেই সে আপনার অজ্ঞাতসারে শিহরিয়া উঠিল। তোরঙ্গের ডালাটি সজোরে তাহার হাতের উপর পড়িল এবং কয়েকটি কাচের চুড়ী ভাঙ্গিয়া তাহার ডান হাতের প্রকোষ্ঠ ক্ষতবিক্ষত করিল। কিন্তু সেদিকে ইন্দিরার মোটেই লক্ষ্য ছিল না। সে একটা আলোকের ক্ষীণ রেখা ধরিয়া, তাহার হৃদয়ের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে পথের সন্ধান করিতেছিল। অল্প ক্ষণেই সে পথের সন্ধান পাইল, সে যেন বুঝিল কেন অমল রাগ করিয়া অমন আত্মহারা ভাবে ছুটিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার মুখ একেবারে রক্তশূন্য পাংশু হইয়া উঠিল, ললাটে ঘর্ম্ম দেখা দিল।

পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, আমি কি পাগল। হয়ত এই খামের এ চিঠি নয়। আর একখানি চিঠি হয়ত টেবিলের উপরেই আছে। এ চিঠির এ খাম কেন হতে যাবে? তোরঙ্গের ডালাটি খোলা ফেলিয়া ইন্দিরা একেবারে শিশিরের পড়িবার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রত্যেক স্থান শতবার করিয়া একখানি চিঠি খুঁজিতে লাগিল কিন্তু চিঠি ত মিলিল না; বরং তাহার মনের অন্ধকার আরও ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

ইন্দিরা জানিত অমল ও শিশির অভিন্নাত্মা; এমন বন্ধুত্ব সে আর কোথাও দেখে নাই। ইন্দিরাও সেই জন্য মুরলার প্রেমে আপনাকে সহজেই বিকাইয়াছিল। বস্তুতঃ অমল, শিশির ও

মুরলাকে লইয়া ইন্দিরা তাহার ক্ষুদ্র জীবনের বীণাটি বেশ করিয়া বাঁধিয়া লইয়াছিল। একই নির্ম্মম আঘাতে সেই বীণার তিনটি তারই যে ছিঁড়িয়া যাইবে। এই চিন্তা তাহাকে আকুল করিতে লাগিল। তাহার চোখের কোণে দুই বিন্দু জল সঞ্চিত হইয়া দৃষ্টির বাধা জন্মাইতেছিল।

হঠাৎ সে ভাবিল, "আচ্ছা এমনও ত হইতে পারে, যে অমল বাবু দিদির চিঠিখানা এখানে ফেলিয়া গিয়াছেন, আর উঁহার নামে যে চিঠি আসিয়াছিল, সে চিঠি তিনি ভুলিয়া লইয়া গিয়াছেন, বা উনি তুলিয়া রাখিয়াছেন!" এই চিন্তায় একটু সে আশ্বস্ত হইতে পারিত, কিন্তু একটি বিষয় অনবরত সে আশ্বাস টুকুকে বাধা দিতে লাগিল—"কই দিদি যে চিঠি লিখিয়াছে, তাহা ত আমাকে উনি বলেন নাই। অন্যবারে ত বলেন। আচ্ছা, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া তবে ইহার মর্ম্ম বুঝিতে হইবে।"

এমনই চিন্তা করিতে করিতে বেলা কাটিয়া গেল। মাথা ধরিয়াছে বলিয়া গৃহকর্ম্ম হইতে সেদিনকার মত সে ছুটি পাইল। শিশির সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিল। মায়ের নিকটে স্ত্রীর অসুখের কথা শুনিয়া, শিশির কিছুক্ষণ পরেই স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইন্দিরা আজ আর কথা কহিতে বড় ইচ্ছা প্রকাশ করিল না—স্বামীর হাতখানি সযত্নে তুলিয়া লইয়া নিজের কণ্ঠদেশে বেষ্টন করিয়া দিল না। শিশির সে সব লক্ষ্য করিল না। সে অন্যমনস্ক ছিল। ইন্দিরা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "অমল বাবু বহরমপুর গেছেন, শুনেছ?

"হাঁ সে যাবে বলেছিল। আমাকেও যেতে খুব সাধ্‌ছিল। আজ কখন গেল ?"

"দুপুর বেলা। তুমি বেরিয়ে যাবার খানিক পরেই তিনি এসেছিলেন।"

"কিছু বলে' গেল ?"

"না, এমন কিছুই না। পান দিলুম, নিয়ে গেলেন।—আচ্ছা, দিদির খবর কি ?"

শিশির একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিল, "কি করে জানব ?"

ঝড়ে প্রদীপ হঠাৎ নিবাইয়া দিলে যেমন একটা অসহনীয় অন্ধকারে ঘিরিয়া ফেলে, তেমনই একটা অন্ধকার যেন ইন্দিরার মনটাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাহার শেষ আশাটুকু পর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত হইল।

অমল দু'দিনের জন্য বহরমপুর আসিয়া, বাড়ী ফিরিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। অমলের মাসীমা দেখিলেন, অমল ইতিমধ্যেই বয়সের অধিক প্রবীণত্ব লাভ করিয়াছে। যাহার মুখ সদা সর্ব্বদা হাসিতে উৎফুল্ল থাকিত, তাহার ললাটে চিন্তার রেখাগুলি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে খেলায় যোগদান করে না, সমবয়স্কের সহিত মেশে না, আমোদে ভোলে না। সে একা থাকিতে ভালবাসে, অল্প কথা কয়, কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে দীপ্তিশূন্য চোখে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে। মাসীমা মনে করিলেন এখনকার কচি ছেলেরা লেখাপড়া শিখিয়াই প্রবীণ স্থির ও গম্ভীর হইয়া উঠে। কালের ধর্ম্ম কি না!

অমলের পিতা অমলকে কলিকাতায় যাইবার জন্য চিঠি লিখিলেন। অমলের মাসীমা উত্তর দিলেন, অমলের শরীর ভাল নয়, কিছুদিন কলিকাতার বাহিরে একটু খোলা হাওয়া খাওয়া তাহার পক্ষে খুব ভাল। অমলের পিতা তাহার কোনও জবাব দিলেন না; অমলের দু'চারখানি চিঠি ছিল, তাহা বহরমপুর পাঠাইয়া দিলেন।

তাহার মধ্যে একখানি চিঠি অমলের স্ত্রীর। অনেক দিন পরে অমলের অধর প্রান্তে একটু শুষ্ক ম্লান হাসি দেখা দিল! তাহাতে কি তীব্র বেদনা ও ঘৃণা মাখানো ছিল, তাহা কেহই দেখিল না। সে চিঠিখানা সরাইয়া রাখিয়া অমল অপর চিঠিগুলি একে একে একাধিকবার পাঠ করিল। তার পর আস্তে আস্তে স্ত্রীর চিঠি খুলিয়া পাঠ করিল—

প্রীতিভাজন,

তোমার চিঠি পাইয়া যে কতদূর সুখী হইয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আমার কোনো গুণ নাই, তবু তুমি আমায় এত ভালবাস! ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এ সৌভাগ্য যেন আমার চিরদিন থাকে! বিদেশে যেন মন কিছুতেই তিষ্ঠে না। কবে আবার কলিকাতায় গিয়া তোমাদের দেখিতে পাইব ভগবান জানেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে যেন এইরূপ তোমার চিঠি পাই। তাহা না হইলে আমি তোমার সঙ্গে আড়ি দিব মনে থাকে যেন। কাশীতে মরিলে সদ্গতি হয় শুনিয়াছি, কিন্তু আমার

সে সদ্গতিরও সম্ভাবনা নাই; যে আত্মার সদ্গতি হইবে তাহা যে তোমাদের কাছে কলিকাতায় রাখিয়া আসিয়াছি। তা আর সদ্গতি হইবে কিসের?

ইন্দিরাকে আমার হৃদয়ের ভালবাসা জানাইও।

একবার কাশীতে আসিয়া আমাদিগকে দেখিয়া গেলে কি দোষ হয়? জানত এখানে একলা ধর্ম্ম করা যায় না, সস্ত্রীক নহিলে ধর্ম্ম হয় না। তাই বুঝিয়া যে ব্যবস্থা হয় করিও।

তোমার পত্রের জন্য পথ চাহিয়া রহিলাম। ইতি—

মুরলা।

অমল এই সংক্ষিপ্ত আন্তরিকতাশূন্য পত্র পাঠ করিতে করিতে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। একবার মনে হইল আর পড়িয়া কাজ নাই যথেষ্ট হইয়াছে। তথাপি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যসহকারে সে তাহার দন্তের মধ্যে অধরকে চাপিয়া, উগ্র রুদ্ধশ্বাসে পত্রপাঠ সমাপ্ত করিল। তাহার ঈর্ষা-কলুষিত মন তাহাকে পত্রখানি ভাল করিয়া পড়িতেও অবসর দিল না। সে চিঠিখানাকে বাম হস্তের মুষ্টিতে সজোরে পিষিয়া যেন ধূলিতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিল; তার পর জানালা দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু গরাদে ঠেকিয়া চিঠিখানা আবার তাহারই চরণে আসিয়া নিপতিত হইল। তখন কি জানি কি ভাবিয়া সে সেই চিঠিখানাকে পকেটে ফেলিয়া গঙ্গার দিকে চলিয়া গেল।

ইন্দিরা শোভাবাজারে তাহার বাপের বাড়ীতে আসিয়াছে। আগে সে দুই একদিনের বেশী থাকিতে চাহিত না; এবারে সে ফিরিয়া যাইবার নামও করে না। কন্যার সুখ দুঃখ মায়ের চোখে বড় শীঘ্র ধরা পড়ে, তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার স্নেহের কন্যার বুকে কোনও অশান্তির ব্যথা বাজিয়াছে। তাই তিনি প্রাণপণে কন্যার যত্ন করিতে লাগিলেন।

শিশির অন্যবারে আপনি ছুটিয়া আসিয়া ইন্দিরাকে লইয়া যাইবার জন্য নানা ছল খুঁজিত! কিন্তু এবারে সেও আর শ্বশুর-বাড়ীর দিকে বড় একটা ঘেঁসিল না! তাহার মনে হইল, হয়ত ইন্দিরা মুরলার চিঠিখানি পাইয়া থাকিবে এবং সেজন্য সে ব্যথিত হইয়াছে। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই শিশিরের পক্ষে শ্বশুর-বাড়ী দূর হইয়া পড়িল। সে সকালে বিকালে সন্ধ্যায় সব সময়ে বাহিরে বাহিরে থাকে, কথা কহিতে বড়ই নারাজ। তাহার মাতা প্রশ্নে প্রশ্নে যখন তাহাকে বড় অস্থির করিয়া তুলিতেন বা বৌকে আনিবার জন্য জেদ ধরিতেন, তখন শিশির অল্প কথায় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া সরিয়া পড়িত। শিশিরের মা বুঝিলেন বৈশাখের সায়াহ্নে মেঘ উঠিয়াছে।

শিশির অমলের স্ত্রীর নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে ঐরূপ প্রেমপত্র পাইয়া ক্ষোভে, ঘৃণায়, লজ্জায় যেন মরিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিল অপরাধ আর কাহারও নহে, তাঁহার নিজের। সে এমন করিয়া অমলের স্ত্রীর সহিত আপনাকে মিশিতে দিয়া ভাল কাজ করে নাই। নারীর কোমল মনে কখন কিসের ছাপ পড়ে,

বলা ত যায় না। সে নিজে সাবধান হইলে এমনটি ঘটিত না। আর বৌদি? কেন মাঝখান থেকে এসে তুমি আমাদের আজন্ম বন্ধুত্ব এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া দিলে? জলের মত অমলকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া ভাসাইয়া দিলে? হায় হায়, রমণীর প্রবৃত্তি কি এত নীচ? শিশির ভাবিয়া ভাবিয়া শরীরকে ক্ষয় এবং নারীর প্রতি অবিশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

অমলের স্ত্রীর চিঠির কোনও জবাব সে দিল না। কিন্তু হ্যামিল্টনের দোকানে গিয়া তাহার ফরমাস মত এক জোড়া দুল অমলের স্ত্রীর নামে কাশীতে পাঠাইতে আদেশ দিয়া আসিল। শিশির মুরলার এই ঘৃণিত লোভ চরিতার্থ করিয়া তাহাকে জানাইয়া দিতে চাহিল যে, তাহার প্রার্থিত প্রণয়োপহার কেবল ঘৃণার দানরূপে আসিয়াছে। অমলের স্ত্রী যখন দেখিবে যে এই দানের সহিত তাহার নামগন্ধ পর্য্যন্ত নাই—চিঠি ত দূরের কথা—তখন বুঝিবে তাহার সাধের দুলে অভিসম্পাত বর্ষিত হইয়াছে। সেই জন্যই সে স্থির করিয়াছিল যে পত্রের কোনও উত্তর না দিয়া শুধু দুল দুটি পাঠাইয়া দিলে তাহার অভিমানে ব্যথা লাগিবে।

শিশির ঠিক অনুমান করিয়াছিল। মুরলা যখন দুল পাইল, অথচ তাহার সঙ্গে একটি মিষ্ট সম্ভাষণও পাইল না। তখন তাহার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিয়াছিল।

এইরূপে যখন সন্দেহ ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের প্রচণ্ড আঘাতে একটি আনন্দময় পরিবারের শান্তি খরস্রোত নদীর শ্যামলশস্পরাজি-

বিরাজিত তটভূমির ন্যায় অল্পে অল্পে ভাঙ্গিয়া ধসিয়া যাইতে বসিয়াছিল, তখন বিধাতা বাম হস্তে তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া ঘটনা-স্রোতকে অন্য দিকে ফিরাইয়া দিলেন।

অমল কলিকাতায় আসিয়াছে ; কিন্তু সে যেন কি এক রকম হইয়া গিয়াছে। অমলের মাতা প্রথমে মনে করিলেন, যে বউকে এখন লইয়া আসিলে অমলের মন শান্ত হইবে—বাছা বিবাহের পরে এতদিন কখনও একলা থাকেনি কিনা। একদিন কথায় কথায় তিনি অমলকে কাশী যাইয়া তাহার স্ত্রীকে লইয়া আসিবার কথা পাড়িলেন। অমল শুধু কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু ক্রমে অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অমলের মাতা বড় ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না।

অমল ভাল করিয়া কথা কহে না। তাহার মুখে হাসি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার মাতা ভাবিলেন, শিশিরও ত মাঝে মাঝে একটু আসিলে পারে! বন্ধু বান্ধবের কাছে থাকিলে, বোধ হয়, তাহার মন প্রফুল্ল থাকিত। কিন্তু শিশিরের কি অন্যায়, বাপু!

এক দিন তিনি অমলকে বলিলেন,

"হ্যাঁরে, শিশির কোথায় ? তাকে ত আর দেখতেই পাই না।"

"আমি জানি না"—বলিয়া অমল পাশ কাটাইয়া যাইবার উদ্যোগ করিল।

মা বলিলেন, "যা না—তাঁকে খেতে বলে আয়, আমি খিচুড়ী

রাঁধতে যাচ্ছি, অনেক দিন পরে দু'ভাইয়ে এক সঙ্গে ব'সে খাবি।"

"আমি ত আজ বাড়ীতে খেতে পাচ্ছিনে, মা। ওঃ, তোমায় বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম, আমাকে আর এক জায়গায় এখনি খেতে যেতে হবে যে।"—বলিয়া অমল চলিয়া গেল।

তাহার মাতা বুঝিলেন কি একটা অনর্থ ঘটিয়াছে। অমলের মা কিছু ভালমানুষ। তিনি দেখিলেন, তাঁহার নিজের বুদ্ধিতে আর কুলায় না। একালের ছেলে-মেয়েদের সবই যেন অদ্ভুত! এই ভাবিয়া তিনি শিশিরের স্ত্রীকে খবর দিলেন। শিশিরকে ডাকিতে ভরসা হইল না। অমলের মায়ের ধারণা শিশিরের স্ত্রী খুব বুদ্ধিমতী; সে যদি কিছু জানে! তাই ঝিকে দিয়া শোভা-বাজারে তাহার বাপের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ঝিকে বলিয়া দিলেন—

"বলিস্ আমার মাথার দিব্যি, অবিশ্যি অবিশ্যি যেন আসে।"

শিশিরের স্ত্রী একটু সকাল করিয়া আসিল। সেও ভাবিল যদি নূতন কোনও খবর থাকে, দেখাই যাক্; আর ত সহ্য হয় না।

অমল বাহিরে গিয়াছে, বাড়ীতে খাইবে না, কাজেই বিকালের পূর্ব্বে তাহার বাড়ীতে ফিরিবার সম্ভাবনা ছিল না। ইন্দিরা প্রথমে যে সঙ্কোচটুকু বোধ করিতেছিল তাহা দূর হইল। অমলের মাতা ইন্দিরাকে লইয়া একটি নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজায় আস্তে আস্তে খিল বন্ধ করিলেন। শেষে তাহার হাত

দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হ্যাঁ বৌমা, অমলের কি হয়েছে গা ? তুমি যদি আমায় বলে দাও। সে যে বৌমার নাম শুনতে পারে না—শিশিরকে খেতে বল্‌তে বল্লুম, চোখ রাঙ্গিয়ে চলে গেল। ব্যাপারটা কি, বল দেখি!"

ইন্দিরা একটু শুষ্ক হাসি হাসিল, তার পরে বলিল, "আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারছিনে মা। ভিতরে কি একটা গোলযোগ হয়েছে! ভাল বুঝে উঠ্‌তে পারছি নে। জানই ত আমি এত দিন বাপের বাড়ী আছি।"

অমলের মাতা দেখিলেন যে ইন্দিরার চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, তাহার সে লাবণ্য আর কিছুমাত্র নাই। প্রথমে ছেলের ভাবনায় তিনি এসব কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। ইন্দিরার চেহারা দেখিয়া তাঁহার অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইল। তিনি তাহার চিবুক ধরিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ মা, তোমার কি এর মাঝে কোন অসুখ হয়েছিল ?"

ইন্দিরা কি উত্তর দিবে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না; তাহার চোখ দুটি কেবল ছল ছল করিয়া উঠিল। অমলের মা ব্যস্ত হইলেন; তিনি তাহার হাত ধরিয়া বাহিরে আনিলেন ও বলিলেন, "আহা, আগে কিছু খা, তার পরে কথা হবে এখন।"

ইন্দিরা খাইতে বসিল। অমলের মা নিজ হাতে তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে বসিলেন। কিন্তু তাঁহার যত্নের আতিশয্যে ইন্দিরার চোখ কেবলই জলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

অমলের মা বুঝিলেন সমবেদনার অব্যক্ত ঘাতপ্রতিঘাতে বলিকার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এতদিন সে তাহার দুঃখরাশি নীরবে বহন করিয়াছে; সে দুঃখের অংশ লইবার মত কাহাকেও সে পায় নাই।

ইন্দিরা কোনও রূপে আহার শেষ করিয়া, অমলের বসিবার ঘরে গেল। সে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল যে সেই ঘর তেমনি আছে, কিন্তু তাহার শ্রী নাই। প্রত্যেকটি আসবাব যেন কেমন একটা বিশৃঙ্খলার হিমস্পর্শে বিগতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। টেবিলের উপর খবরের কাগজ ও ছেঁড়া চিঠির খাম রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। বইগুলি শেল্‌ফ্‌ আলমারী ছাড়িয়া মেজেয় গড়াগড়ি দিতেছে। কার্পেটে ধূলা জমিয়া ধূসর হইয়াছে। আল্‌নার কাপড় চেয়ারের পৃষ্ঠে স্থান লাভ করিয়াছে। একখানি আরাম কেদারার উপর রাজ্যের ময়লা কাপড় জড়ো করা রহিয়াছে। ইন্দিরার মনে হইল, অমল বাহিরে গিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ছাপ যেন সমস্ত কক্ষটিতে, কক্ষটির সমস্ত দ্রব্যে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি উপস্থিত নাই, কিন্তু তাঁহার সমস্ত বেদনা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া এই ঘরটি জুড়িয়া রহিয়াছে। ইন্দিরা কিছুক্ষণের জন্য নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেল। সে আস্তে আস্তে জানালাগুলি খুলিয়া দিল এবং মনে মনে অমলের মাতার নিন্দা করিতে লাগিল; তিনিও ত ঘরটিকে একটু গুছাইয়া রাখিতে পারিতেন!

অমলের মাতা আহারে বসিয়াছেন, ইন্দিরা সময় কাটাইবার

জন্য অমলের কক্ষ সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এক এক করিয়া টেবিল চেয়ার মেজে পরিষ্কার করিয়া ফেলিল, আল্‌না হইতে ময়লা কাপড় জামাগুলি টানিয়া এক জায়গায় জড়ো করিল এবং চাদরে সে গুলি বাঁধিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে সে শার্টের বোতামগুলি খুলিয়া টানার ভিতরে রাখিল এবং প্রত্যেক জামার পকেট হইতে কাগজ পত্র যাহা কিছু ছিল সেগুলি বাহির করিয়া চিঠির র‍্যাকের মধ্যে সাজাইয়া রাখিল।

সে সকলের মধ্যে একখা'ন চিঠি তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল—সেখানি মুরলার। চিঠিখানিকে যেন কেহ মুচড়িয়া মুচড়িয়া নিতান্ত অযত্নে রাখিয়া দিয়াছে। বহরমপুর থাকিতে অমল এই চিঠি প্রাপ্ত হইয়াছিল; সে ফেলিয়া দিতে দিতে চিঠিখানি রক্ষা পাইয়াছিল। তাহার সমস্ত ঘৃণা ও ঈর্ষাদ্বেষ এই চিঠিখানিকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল—ইন্দিরা যেন সেই ইতিহাসটুকু বুঝিতে পারিল। তাই সে কোমল হস্তে চিঠিখানিকে টেবিলের উপর বিছাইয়া সমান করিতে চেষ্টা করিল। তার পরে টেবিলের উপর বসিয়া ধীরে ধীরে চিঠিখানি পড়িল। সে ভাবিতেছিল কেন এমন হইল? মুরলা ত এমন ছিল না! স্বামীর প্রতি যাহার অমন প্রেম, তাহার এমন হইবে কেন?

অমলের মাতা আসিতেই সে চিঠিখানি মুড়িয়া টেবিলের উপর কাগজচাপার নীচে রাখিয়া দিল। ইন্দিরার মুখ আরও বিষণ্ণ ও গম্ভীর দেখিয়া অমলের মাতা কোনও প্রশ্ন করিলেন না।

কিছুক্ষণ পরেই ইন্দিরা বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

দুইচারি দিন বাদে অমলের মাতা আবার তাহাকে আনিতে পাঠাইলেন।

আজ যখন ইন্দিরা আসিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল, তখন তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার চিবুকে হস্ত দিয়া প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ইন্দিরা ধীরে ধীরে অমলের ঘরের দিকে গেল। সে আসিতেই অমল কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিল। অমলের চেহারা দেখিয়া ইন্দিরার অন্তরাত্মা যেন ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চাহিল। এই ক'দিনে এমন সুন্দর চেহারা যে এই রকম শ্রীহীন হইয়া যাইতে পারে, ইন্দিরা তাহা কল্পনাও করিতে পারিত না। সে কি বলিবে, ভাবিয়া পাইতেছিল না। পরে শুধু জিজ্ঞাসিল—

"কেমন আছেন?"

অমল শুষ্কভাবে উত্তর দিল, "মন্দ কি?"

"দিদির খবর পেয়েছেন কি?"

অমল প্রথমে চুপ করিয়া রহিল; কোনও রূপে পরিত্রাণ পাই-বার যো নাই, ভাবিয়া সে একখানি চিঠি টেবিলের উপর হইতে লইয়া ইন্দিরার দিকে ছুঁড়িয়া দিল; ইন্দিরা সেখানি পড়িল—

প্রিয়তম,

অনেক দিন তোমার পত্র পাই নাই। মাসীমার মেয়ের বিবাহে বহরমপুর যাইবে লিখিয়াছিলে। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম সেখানকার কাজের ভিড়ে চিঠি লিখিতে অবসর পাও নাই। কিন্তু পটলের

চিঠিতে জানিলাম, তুমি কলিকাতায় আসিয়াছ ; সেও প্রায় আট দশ দিন হইল। এর মধ্যে কি এক ছত্র লিখিবার সময় পাইলে না ? আমিও এত দিন চিঠি লিখি নাই, মনে করিয়াছিলাম আর লিখিব না। প্রতিদিন তোমার পত্রের জন্য পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, এখন সে আশাও পরিত্যাগ করিয়াছি।

আমার উপর কি তুমি রাগ করিয়াছ ? আমি এপর্য্যন্ত কখনও কিছু চাই নি। তোমার নিকট কিছু চাহিলে কি এমনই গুরুতর অপরাধ হয় ? আচ্ছা, আর চাহিব না। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। তুমি কি মনে কর, আমরা শুধু দুই একখানা কাচের খেলনার জন্য এমন ক'রে তোমাদের পায়ে আত্ম-বিক্রয় করি ? বড়ই ভুল বুঝেছ আমাদের তুমি। আর যা কর, সইতে পারি, ঘৃণার দান গ্রহণ করিতে পারি না।

তুমি এমন নিষ্ঠুর হইবে, কখনও মনে ভাবি নাই, আমি তোমার পায়ে কি অপরাধ করিয়াছি, তুমিই জান। কিন্তু এ কয়দিন কি শাস্তি ভোগ করিতেছি, তাহা কেবল বিশ্বেশ্বর জানেন !

হতভাগিনী

মুরলা

চিঠি পড়িয়া ইন্দিরা আবার তাহা খামে পুরিয়া রাখিতে রাখিতে জিজ্ঞাসা করিল,

"এ চিঠি কবে পেলেন ?"

"এই খানিক আগে।"

"ও পার্শেল কিসের?" একটি পার্শেল টেবিলের উপর ছিল।

"জানি না" বলিয়া অমল এমন ভাব দেখাইল যেন সে আর কথাবার্ত্তা কহিতে নারাজ। ইন্দিরা তাহা লক্ষ্য করিয়াও করিল না। সে একটু অগ্রসর হইয়া পার্শেলটি হাতে লইল এবং শিরোনামা দেখিয়া বলিল,

"এ যে বেনারসে থেকে পাঠিয়েছে।"

"তা হবে।"—অমল এমন ভাবে কথাটা বলিল যেন সে তথ্যটি তাহার জানিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

ইন্দিরা বুঝিল যে অমল জানিয়া শুনিয়াও উপেক্ষাভরে উহা রাখিয়া দিয়াছে ; সে ব্যথিত হইল।

সে একখানি কাগজ-কাটা ছুরি লইয়া, পার্শেলটি খুলিল ও তাহার মধ্য হইতে একটি শ্বেত মখমলের কেস্ বাহির করিয়া খুলিয়া ফেলিল, দেখিল একজোড়া দুল। সে অজ্ঞাত সারে শিহরিয়া উঠিল।

ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করিল, "এ দুলদুটি ত খাসা ; কবে কিন্‌লেন?"

অমল প্রথমতঃ নীরবে রহিল ; পরে ঘৃণার সহিত বলিল, "আমি আপনারই মত ও-দুল এই প্রথম দেখ্‌ছি।"

ইন্দিরা বড়ই সঙ্কটার মধ্যে পড়িল। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল

"আপনি এ দুল দিদির জন্য কেনেন নি?"

"পূর্ব্বেই ত জবাব দিয়েছি।"—অমল এই কথা বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল এবং অশান্ত ভাবে পাদচারণা করিতে লাগিল।

ইন্দিরা হঠাৎ কি মনে করিয়া বাহিরে আসিল এবং অমলের মাতাকে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়াই দ্রুতপদে নামিয়া গেল। তাহার জন্য গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল; সে অল্পক্ষণ মধ্যেই শোভাবাজার তাহার বাপের বাড়ীতে আসিল এবং অপেক্ষা না করিয়াই আবার কাঁসারীপাড়ায় ফিরিয়া গেল।

অমল টেবিলের উপর ভর দিয়া দুই হস্তের মধ্যে মস্তক রাখিয়া ভাবিতেছিল। সে এ রহস্যের কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। দুল পাঠাইবার জন্য মুরলা লিখিয়াছিল—শিশিরকে। সে দুল নিশ্চয়ই শিশির তাহাকে পাঠাইয়াছে। এ কি সেই দুল? তাহা হইলে, মুরলা তাহা অমলকে ফেরত পাঠাইল কেন?

এমন সময় ইন্দিরা সে কক্ষদ্বারে দেখা দিল। তাহার চোখে মুখে একটা অস্বাভাবিক আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিয়া অমল তাহার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। ইন্দিরা বলিল,

"সেদিন দিদির একখানি চিঠি টেবিলের উপর রাখিয়া গিয়াছিলাম। সে চিঠি খানি আমাকে একবার দিবেন?"

অমল এ ধারে ও ধারে খুঁজিতে লাগিল। ইন্দিরা দেখিল কাগজ চাপার নীচে সে চিঠি তেমনই ভাবে রহিয়াছে। সে চিঠি খানি তুলিয়া লইল। বহরমপুরে প্রাপ্ত সে চিঠি অমল চিনিতে পারিল।

ইন্দিরা তারিখটা একবার দেখিয়া লইল। এইবার তাহার

অধরে, নয়নে একটি কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠিল ; সে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে আর একখানি চিঠি বাহির করিয়া অমলের দিকে ছুঁড়িয়া দিল এবং বলিল,

"এই নিন আপনার চিঠি। আপনার বন্ধুর চিঠি খানি যা এতদিন আপনার নিকট এরূপ অবস্থায় থাকা উচিত হয় নি তা নিয়ে গেলুম। তাঁকে দিব।"

ঘোর অন্ধকার ঘরে যুগপৎ সহস্র দীপ জ্বলিয়া উঠিলে, যেমন এক নিমেষে সমস্ত সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অমলের মনের এত দিনের জমাট বাধা অন্ধকার তেমনই মুহূর্ত্তে অপসারিত হইয়া গেল। সে ইন্দিরার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল ;—তখন সে যে কি করিতেছে, সে দিকে তাহার খেয়ালই নাই।

ইন্দিরা বক্রহাসি হাসিল। বলিল, "দিদিকে যদি বাঁচাতে চান, তবে আজই কাশী চলে যান। আপনার অপরাধের জন্য পায়ে ধরে তাঁর ক্ষমা চাইবেন।"

অমল বলিল, "একমিনিটের জন্যে ঐ চিঠিখানি আমাকে দিতে হচ্চে।"

ইন্দিরা বহরমপুরের সেই চিঠিখানি অমলের দিকে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "তবে আপনিই যাঁর চিঠি তাঁকে দেবেন।"

ইন্দিরা চলিয়া গেল।

মেঘ অপসারিত হইয়া গেল, অপরাহ্ন-রবির একটি কিরণ-রেখা রুদ্ধ বাতায়ন পথে প্রবেশ করিয়া অমলের ললাটে রাজটীকা পরাইয়া দিয়াছিল। অমল তাহার স্ত্রীর দু'খানা চিঠি পাশাপাশি

রক্ষা করিয়া সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিতে পারিল। একই দিনে লেখা তাহার চিঠিখানি যে ভুল ক্রমে শিশিরের খামে ও শিশিরের চিঠি-খানি তাহারই খামে আসিয়াছে, তাহা আর তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাহার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য যে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এই অভাবনীয় সন্তোষজনক পরিণামের কল্পনায় এক অভিনব আনন্দবিজড়িত দুঃখে পরিণত হইল। সেই দিনই সে শিশিরের সঙ্গে দেখা করিয়া কাশীতে রওনা হইবে স্থির করিল।

ইন্দিরা তাহার বাপের বাড়ী গিয়া মায়ের পদধূলি লইয়া শ্বশুর-বাড়ী যাত্রা করিল। সে যে সময়ে স্বামীর প্রতি বিদ্রূপের শাণিত অস্ত্রগুলি প্রয়োগ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে অমল ঝড়ের মত সে ঘরে প্রবেশ করিল এবং পুনঃ পুনঃ নিবিড় আলিঙ্গনে শিশিরকে অস্থির করিয়া তুলিল।

ইন্দিরা সে দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না; কাঁদিয়া ফেলিল। শিশির সমস্তই বুঝিল; তাহারও চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিয়াছিল।

সে নিজে অমলের বাড়ীতে আসিয়া তাহার কাশী রওনার মত জিনিষগুলি গুছাইয়া দিল। সেই কানের দুল দুটি এবার সে অতি যত্ন করিয়া নিজের একখানি ভাল রেশমী রুমালে জড়াইয়া দিল।

শিশির হঠাৎ অমলের হস্ত গ্রহণ করিল এবং রুমালে জড়ানো দুল দুটি সেই হস্তের মধ্যে স্থাপন করিয়া ছল ছল চোখে বলিল "অমল দা, আমার একটি অনুরোধ রাখিবে কি?"

অমল দৃঢ়ভাবে শিশিরের হস্ত দুখানি চাপিয়া ধরিল।

শিশির বলিল, "দেখ, আমি যে এই দুল পাঠিয়েছিলাম, এই কথাটি কখনও বৌদিকে বোলো না। আমি দোকানে গিয়ে শুধু বৌদির ঠিকানাটা দিয়ে তাদের পাঠাতে বলে এসেছিলাম। বৌদি জানে তুমিই দুল পাঠিয়েছিলে, সে ভুল তার এবারে সংশোধন হয়ে যাবে। কিন্তু আমাকে তুমি যেন এর মধ্যে জড়িও না। তোমার পায়ে পড়ি, এইটুকু শুধু মনে রেখো। আমি ভাল করেছিলাম কিনা, সেটা আমিই ভাল করে ঠাহর করতে পারিনি। তখন যা ভাল বলে মনে হয়েছিল, তাই করে ফেলেছিলাম। তুমি তার জন্যে আমায় ক্ষমা করতে পারবে জানি। কিন্তু বৌদি জানতে পেলে আমায় জীবনে কখনও ক্ষমা করবে না। আমি সে বেচারীর উপর বড় অন্যায় করে বসেছিলুম। ভগবান যে আমার মুখ রক্ষা করেছেন—"

শিশির আর বলিতে পারিল না। অমল তাহাকে আর কিছু বলিতে দিল না। সে একবার তাহার আশৈশব বন্ধুর অমূল্য প্রেমের অমর্য্যাদা করিয়া অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে। শিশিরকে অবিশ্বাস? সে কেমন করিয়া এমন অসম্ভব কাজ করিয়া বসিল, তাহাই ভাবিয়া সে লজ্জিত হইতেছিল।

এতদিন যে প্রণয় হৃদয়ের মধ্যে রুদ্ধ থাকিয়া কতবার সে দুর্ব্বল বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল, আজ তাহা বন্ধনমুক্ত হইয়া দুইটি হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া দিল। সে তাহার আনন্দের বিপুল উচ্ছ্বাসে সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। শিশিরকে বক্ষে চাপিয়া

ধাক্কা দিয়া—আরও কত স্নেহের পীড়নে সে অস্থির করিয়া তুলিল।

শিশির অমলকে হাওড়ায় ট্রেণে তুলিয়া দিয়া আসিল।

অমল কাশীতে পৌঁছিয়া তাহার অপরাধের মাত্রা বুঝিতে পারিল। তাহার মর্ম্মান্তিক উপেক্ষায় মুরলা সত্য সত্যই মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে বসিয়াছিল। নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় ভয়ে ভয়ে সে মুরলাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া, তাহার কানে সেই দুল দুটি পরাইয়া দিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল; আর কিছুই বলিতে পারিল না। কেন না এদিকে ইহাদের জীবনে যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে, মুরলা ত তাহা কিছুই জানিত না।

প্রতিদান

একটি ছোট নদী, আর তার তীরে আম্রকুঞ্জে ঘেরা একখানি ছোট গ্রাম। নদীর ওপারে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে বাতাস সোণার ঢেউ তুলিয়া বহে। নদীতে পাল তুলিয়া ছোট ছোট নৌকা আপন মনে চলিয়া যায়; মাঝিরা মনের সুখে বৈঠার তালে নিশীথ রাতে "সারি" গায়, আর নদীর বক্ষে এবং পল্লীবাসিনীর সুপ্তি-বিজড়িত স্মৃতিতে একটি মধুময় রেখা টানিয়া দিয়া যায়। বিকালে মেয়েরা আলতা পায়ে নোলক নাকে কলসী কাঁখে দুলিতে দুলিতে গমন করে। যুবতীরা ঘাসের উপর সিক্তপদের অলক্তক-রেখা একটু গ্রীবা বাঁকাইয়া দেখিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া চলিয়া যায়।

ঘাটের কাছে অশথতলায় যে বেচারী তাহাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে, তাহাকে কেহ দেখিয়াও দেখে না—সে যে নিরীহ! মূক, পরিত্যক্ত, বয়সে সে যুবক, কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিলে তাহাকে শিশুর মত বোধ হইত—নির্ম্মল, সরল হাস্যময়। সেই জন্য কেহ তাহাকে দেখিয়া সংকুচিত হইত না। বর্ষীয়সীরা তাহাকে দয়া করিতেন—আহা, তাহার কেহ নাই, সে অনাথ। যুবতীরা তাহার জন্য দুঃখ করিত—সে এত সুন্দর অথচ কেন মূক? বালিকারা তাহাকে যত্ন করিত—কেন না সে ঘাসের

লতায় বকুল ফুলের মালা গাঁথিয়া তাহাদের খোঁপায়,কানে গুঁজিয়া দিত। সে শৈশব হইতে ঐ ঘাটের কাছে, গাছের তলায় অমনি করিয়া শুইয়া থাকিত, কাজেই রমণীগণের স্নানের ঘাটে, অত বড় একটি বয়স্ক শিশুকে থাকিতে দেখিয়াও কেহ বড় একটা কিছু মনে করিত না। গৃহকর্ম্মব্যাপৃতা কুলবধূ সাঁঝের বেলায় যখন একলা ঘাটে আসিতে বাধ্য হইতেন, তখন ভাবিতেন, সেখানে "পুণ্য" আছে। স্নানান্তে যখন তীরে উঠিয়া দেখিতেন, বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, অন্ধকার পথ, তখন পুণ্যার দিকে চাহিলে সে বুঝিত যে তাহাকে সঙ্গে যাইতে হইবে। গৃহ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসা, তাহার কার্য্য ছিল। কোনও বাড়ীতে ঠাকুরের "বৈকালী ভোগ"ও তাহার ভাগ্যে কখনও কখনও জুটিয়া যাইত। অথবা আঙ্গিনায় যেখানে ছেলের দল ছুটাছুটী করিতেছে, সেও কিছুক্ষণ সেখানে তাহাদের খেলার সাথী হইয়া পড়িত।

'পুণ্য' ঘোষেদের বাড়ীর ছেলে, সংসারে তাহার আপনার বলিতে কেহ ছিল না। তাহার এক জ্ঞাতি তাহার সম্পত্তিটুকু আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাকে ঠিক আপনার করিয়া লইতে পারেন নাই। একটি নিতান্ত অনাবশ্যক অথচ অপরিহার্য্য ভারের ন্যায় পুণ্য তাঁহার স্কন্ধে পড়িয়াছিল। পুণ্য কোথায় থাকে, কোথায় খায়, কেহ তাহার খোঁজ রাখিত না। রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যেই সে বর্দ্ধিত ; রৌদ্রবৃষ্টি কখনও তাহার অনিষ্ট করিত না। তাহার অসুখেও কেহ বড় একটা অসুখী হইত না। একজন কেবল তাহার দুঃখে কখনও কখনও ব্যথিত হইত। সে গ্রামের একটি

বধূ। একবার যখন পুণ্য অসুস্থ হইয়া শয্যার আশ্রয় লইয়াছিল, তখন সেই বধূই তাহার খোঁজ করিয়াছিল।

সে—বালিকা; পুণ্যরই এক দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি, ললিতের স্ত্রী। বিবাহের পর স্বামিগৃহে আসিয়া, বালিকা বধূ সুরবালা দুঃখের সহিত কিছু কিছু পরিচয় লাভ করিয়াছিল। সে তাহার মাতার আদরের কন্যা; গৃহকর্ম্ম ভাল করিয়া শিক্ষা করে নাই। কাজেই স্বামিগৃহে শাশুড়ীর তিরস্কারে, ননদের বিদ্রূপ-বাণে তাহাকে বড় কাতর হইয়া পড়িতে হইত। তাহার বিমর্ষ ভাব দেখিয়া পুণ্য বুঝিত। সে যখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এক প্রকার শুষ্ক মলিন হাসি হাসিত, তখন সুরবালাও বুঝিত যে মূকেরও হৃদয় আছে। একদিন—সে আজ ছ'মাসের কথা—সুরবালা একলা ঘাটে আসিয়া জলে তাহার কলসী ভাসাইয়া তরঙ্গ তুলিতেছিল, আর তাহার চক্ষু দুটি অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। ললিতের বড় অসুখ। তাহার অবস্থা এমন খারাপ হইয়া উঠিয়াছিল যে গ্রামের সকলেই ললিতের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহকর্ম্ম না করিলে নয়, তাই সুরবালা জল লইতে আসিয়াছিল এবং বিরলে তাহার মনোবেদনা দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দিতে গিয়া চোখের জলে আপ্লুত হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন পুণ্য তখন সেখানে ছিল না। কলসীতে জল পূরিয়া যেমন সে তীরে উঠিল, অমনি দেখিল পুণ্য তাহার সম্মুখে। আর কোনও দিন সে এত কাছে আসে নাই। সুরবালা একটু সঙ্কুচিত হইল, কিন্তু সে চাহিয়া দেখিল আজ পুণ্যর মুখে সে হাসি নাই, তাহার মুখখানি

আজ বিষাদের ছায়ায় ম্লান, তাহার নয়নপংক্তিও বুঝি আর্দ্র। সে একটি বিল্বপত্র সুরবালার সম্মুখে ধরিল। সিন্দুরাঙ্কিত বিল্বপত্র দেখিয়া সুরবালা দেবীর নির্ম্মাল্য বলিয়া চিনিল। সে ভক্তিভরে তাহা বাড়ীতে লইয়া গিয়া স্বামীর মস্তকে রক্ষা করিল। ললিত সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। সুরবালা বুঝিয়াছিল যে, তাহার এই নূতন জীবনে পুণ্য—মূক, নির্ব্বোধ পুণ্য—তাহার সুখ দুঃখের সাথী।

তাহার পর, যখন সে ঘাটে আসিত, তখন দেখিত, তাহাকে দেখিলে পুণ্য আনন্দিত হয়। সে বুঝিত এই অসহায় মূঢ়কে সে তাহার নিজের মায়ায় বশীভূত করিয়াছে। পুণ্য ঘাসের লতায় শেফালির মালা গাঁথিয়া সুরবালাকে কখনও কখনও দিতে যাইত; সুরবালা হাসিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিত। জানিত না, কেন সে দিতে চায়। সে বোবা,—সে অবোধ।

(২)

ললিত বহুদিন পরে আজ তাহার স্ত্রীকে লইয়া কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিতেছেন। সুরবালা এই প্রথম স্বামীর সঙ্গে যাইতেছে, সে অন্তরে সুখ, চোখে জল এবং বক্ষে তাহার শিশুপুত্রটিকে লইয়া নৌকায় উঠিল। তাহার শ্বাশুড়ী, ননদ ও প্রতিবেশিনীরা তাহাকে বিদায় দিবার জন্য স্নানের ঘাটে আসিয়াছেন। বালিকারা হাত বাড়াইয়া সুরবালার পুত্রকে প্রলুব্ধ করিতেছিল। বিদায় লওয়া শেষ হইলে নৌকা যখন ছাড়িয়া দিল, তখন কোথা হইতে পুণ্য আসিয়া নৌকার উপর আবির্ভূত হইল।

ললিত প্রথমতঃ তাহাকে আসিতে দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন, শেষে যখন দেখিলেন যে সে নামিয়া যাইতে মোটেই রাজি নয়, তখন একটু চিন্তিত হইলেন। মাঝিরা আবার নৌকা ভিড়াইল। ললিত অনেক বুঝাইয়া পুণ্যাকে নামিয়া যাইতে বলিলেন; শেষে একটু ভয় দেখাইতেও ছাড়িলেন না। তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে সে স্বেচ্ছায় নামিয়া না গেলে, তাহাকে বলপূর্ব্বক নামাইয়া দেওয়া হইবে। তাহাতেও পুণ্য নামিয়া গেল না। সে কেবল কাতর ভাবে ললিতের দিকে ও প্রতিবেশিনীগণের দিকে চাহিয়া বুঝাইল যে, সে তাহার সঙ্গে যাইতে চাহে। ললিত বলপ্রকাশ করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু বিরত হইলেন; ভাবিলেন, "উহার ত কেহ নাই। উহাকে কেহই ত চাহে না। যদি তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চায়, তাহাতে ক্ষতি কি? বিদেশে অমন একটি লোক অনেক কাজে লাগিবে।" ললিতের মাতাও সেই কথা ভাবিতেছিলেন। পুণ্যর অভিভাবিকা ঘাটে আসিয়াছিলেন, তিনি ললিতের ক্ষীণ সংকল্পে বাতাস দিয়া বলিলেন, "পুণ্য যেতে চায়, যাক্ না, দিন-কতক দেখে শুনে আসুক।"

ললিত বলিলেন, "আচ্ছা, বৌদি, দাদাকে তবে বলো।"

নৌকা ছাড়িয়া দিল। পুণ্যও যাইতেছে ভাবিয়া সুরবালা সুখী হইল। ভাবিল, "আমার এই দুরন্ত দুলালটিকে ত পুণ্য দেখিতে পারিবে।" সুরবালাকে বিদায় দিয়া রমণীগণ বিষণ্ণমনে গৃহে ফিরিলেন। পুণ্যও যে চলিয়া গেল, সে কথাও বারবার তাঁহাদের মনে পড়িতে লাগিল। আহা, বেচারী পুণ্য এই ক্ষুদ্র পল্লীর

জীবনের সহিত যে একরূপ জড়িত ছিল। স্নানের ঘাটের অশ্বত্থগাছটি ঝড়ে পড়িয়া গেলে তাহার অভাব যেমন শতবার লোকের মনে পড়িত, স্নানের ঘাট যেমন শূন্য ঠেকিত, মৌন, মূক পুণ্যর অভাব তেমনি আজ অনেকবার গৃহললনাগণের মনে হইতে লাগিল। সুরবালাকে বিদায় দিয়া কেহ কেহ যে কাঁদিয়াছিলেন, সে কেবল সুরবালার জন্য নহে, কয়েক বিন্দু অশ্রু পুণ্যরও প্রাপ্য ছিল। সে ঐ নিরালা গাছতলায় বসিয়া নদীর বাঁকের দিকে, ওপারের ক্ষেতের দিকে, দূরের নৌকাখানির দিকে চাহিয়া থাকিত; নদীতীরস্থ কালীবাড়ীতে যখন পূজার উৎসবে সকলে মাতিত, তখন তাহার এক পার্শ্বে বকুলতলায় বসিয়া সে একমনে ঝরাফুলের মালা গাঁথিত; কেহ এ সকল দেখিয়াও দেখিত না; কিন্তু কর্ম্ম-কোলাহলময় পল্লীজীবনের অন্তরালে যে অচঞ্চল, শান্ত, পুরাতনের স্মৃতি-বিরচিত একটি প্রচ্ছন্নভূমি ছিল, পুণ্য তাহার অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়াছিল।

(৩)

ললিত ফুলবাড়ীর পোষ্টমাষ্টার। ডাকঘরের পিছনেই বাসা। পল্লীগ্রামের ডাকঘর, পোষ্টমাষ্টারকে সর্ব্বদাই আফিসে হাজির থাকিতে হয়। তাহা হইলেও কাজের মধ্যে বহুবার বাসায় আসি-তেও বাধা নাই; দ্বিপ্রহরে নিদ্রারও ব্যাঘাত হয় না, এবং সন্ধ্যার পরে ডাক রওনা হইয়া গেলে আপিস ঘরে আসিবারও প্রয়োজন থাকে না। আবার যখন লোকসমাগমের সম্ভাবনা বড় থাকে

না, তখন সেই সরকারী ডাকঘর ললিতবাবুর বে-সরকারী অন্দরেও পরিণত হয়। আপিসে পিয়নই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। আর একজন "রাণার" বা ডাকবাহী, তাঁহার অবসরকালে, গৃহকর্ম্মে তাঁহার সহায়। সুরবালা গৃহস্থালীর কাজ দেখে, রন্ধন করে এবং অবশিষ্ট সময় স্বামীর সঙ্গে, ছেলের সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া কাটাইয়া দেয়। ছেলেকে লালন পালন করা তাহার নিত্যকার্য্যের মধ্যে নয়। পুণাই তাহার ভার লইয়াছে। সে দুরন্ত শিশু ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, আর পুণ্য অনবরত তাহার পিছু পিছু থাকে। "কালুকে" সামলাইতে বেচারীর যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। কালু পুণ্যার সঙ্গটা যে বেশ পছন্দ করিত, তাহা মোটেই বোধ হইত না। সে তাহার নিজের খেয়ালের পশ্চাতে ছুটিত, আর পুণ্য বেচারী নানামতে তাহাকে ভুলাইয়া সামলাইয়া লইয়া বেড়াইত। ইহাতে পুণ্য যে কিছু আমোদ পাইত, তাহা অন্ততঃ তাহাকে দেখিলে মনে হইত না। তবুও সে যে কেন করিত, কেন সেই অদম্য বালকের অত্যাচার সহ্য করিত, তাহা সেই জানে!

কেবল সুরবালা জানিত, পুণ্য যতই খাটুক না, যতই তাহার কষ্ট হউক না, সে একবার তাহার দিকে চাহিলে, একবার একটু মিষ্ট কথা কহিলে তাহার সকল ক্লেশ যেন দূর হইত, সকল শ্রম যেন সার্থক হইত। তাই সুরবালা সে বিষয়ে কখনও কৃপণতা করিত না। দুইটি শিশুকে লইয়া ঘরকন্না করিতে করিতে সে তাহাদের ক্ষুদ্র সুখদুঃখগুলি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। একটি শিশু

কথা কহিতে জানে, কিছুই বোঝে না; আর একটি শিশু যেন বোঝে সবই, কিন্তু কথা কহিতে জানে না। এক শিশু কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া মারিয়া ধরিয়া অস্থির করিয়া তুলে, আর একটি শিশু নীরবে সে সকল সহ্য করে। সুরবালা ক্রমে বুঝিয়াছিল যে ইহার একটিকেও নহিলে তাহার সংসার চলে না। আর কেহ সে কথা বোঝে নাই।

ললিত যখন একের অবাধ্যতায় বিরক্ত হইয়া, অপরকে বকিতেন, শাসন করিতেন, তখন সুরবালা মাঝখানে থাকিয়া তাঁহার সে বাক্যবাণের ধারটুকু হরণ করিয়া লইত। একটি কটাক্ষে, একটু হাসিতে সে ঐ অসহায় বেচারীর সমস্ত দুঃখ সমস্ত অভিমান মুছাইয়া দিত। পুণ্য যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে বারান্দার এক প্রান্তে বসিয়া ঝিঁঝিঁর রবে বিভোর হইয়া থাকিত, তখন সুরবালা বুঝিত যে পুণ্য তাহার ছায়ায় ঘেরা, পুলকভরা নদীতীরের কথা ভাবিতেছে। সেই তর্‌তর্ করা নদী, সেই ঢেউখেলা ধানের ক্ষেত, সেই কালীবাড়ীর কোলাহল—এ সব পুণ্য ভুলিবে কি করিয়া? সুরবালা কখনও কখনও ভাবিত পুণ্য সেখানে থাকিলেই ভাল ছিল!

ললিত এ সকল বুঝিতেন না। তাঁহার "দুষ্ট" ছেলেটিকে পুণ্যার উপর ফেলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত কি না এ সন্দেহও কখনও কখনও তাঁহার মনে হইত। কারণ সে যে ভয়ানক বোকা! কিন্তু একবার কালুর যখন ব্যারাম হয়, তখন তিনি দেখিয়াছিলেন পুণ্য কি অদ্ভুত শুশ্রূষা করিয়াছিল। আহার নিদ্রা

ত্যাগ করিয়া যখন এই অনাথ মূক বেচারী তাঁহার পুত্রের শয্যার পার্শ্বে জননীর অপেক্ষাও অধিক ব্যগ্রতা লইয়া অতন্দ্রিত ভাবে বসিয়া থাকিত, তখন ললিতের মনে হইত, বিধাতা তাহাকে বড় কৃপা করিয়াই বিদেশে এই অদ্ভুত সম্পদ জুটাইয়া দিয়াছেন। মাহিনা ত লাগেই না, তার উপর সহস্র টাকা দিয়াও যাহা মিলে না, ইহার নিকট হইতে সেই অকৃত্রিম সেবাটুকু পাওয়া যায়।

সুরবালা দেখিত, তাহার দুঃখে ব্যথিত পুণ্য তাহার ছেলেটির জন্য যমের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পুত্রের জন্য আশঙ্কায় যে দিন তাহার মন আকুল হইয়া পড়িত, সে দিন পুণ্যর খাওয়া হইত না। সুরবালা যে দিন বিষণ্ণ মুখে, শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরে তাহাকে ভাত দিতে আসিত, সেদিনও পুণ্য খাইতে পারিত না। শিশুস্বভাব পুণ্যর মুখখানি যেন সুরবালার মুখের একখানি জীবন্ত, স্বচ্ছ দর্পণ। তাহাদের গ্রামের স্বচ্ছ নির্ম্মল নদীটি যেমন আকাশখানির আলো ও ছায়া প্রতিবিম্বিত করিত, পুণ্যর হৃদয়েও তেমনি সুরবালার সুখ দুঃখের আভাসটুকু পর্য্যন্ত প্রতি-ফলিত হইত। সেই জন্যই অনেক দিন পুণ্যর ভাল করিয়া খাওয়া হইত না! সুরবালা সে কথা জানিত, আর মনে করিত আহা, ওর কেহ নাই।

একদিন পুণ্য কিছুতেই খাইল না। সে দিন সুরবালাই পুণ্যকে বকিয়াছিল। তাহার ছেলেটি প্রজাপতির পশ্চাতে ছুটিয়া কাঁটাবনের ভিতরে গিয়া পড়িয়া সমস্ত অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া

লইয়া আসিয়াছে। তাহাকে ধরিতে গিয়া পুণ্যর অঙ্গও অক্ষত ছিল না। কিন্তু তাহা কেহ দেখিল না। সেই দুষ্ট শিশু যখন সর্ব্বাঙ্গে রক্তের চিহ্ন লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া কাঁদিয়া পল্লী অস্থির করিয়া তুলিল, তখন সুরবালার চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে পুত্রকে পুণ্যর কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তীব্রভাবে তাহাকে ভর্ৎসনা করিল। আফিস ঘর হইতে ললিত আসিয়া, কালুর অবস্থা দেখিয়া পুণ্যকে মারিতে উদ্যত হইলেন। সুরবালা তাহাতেও কিছু বলিল না। এবার পুণ্যর চোখে জল আসিল ; সে ধীরে ধীরে অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেল। তাহার বলিবার অনেক কথা ছিল, কিন্তু হায়, বিধাতা ত তাহাকে বলিবার শক্তি দেন নাই। সে নীরবে অশ্রুমোচন করিল, সে দিন আর আহার করিল না।

ক্রোধ শান্ত হইলে সুরবালা বুঝিয়াছিল যে কালুরই দোষ, পুণ্যর কোনও দোষ নাই। দুঃখের বেগ উপশমিত হইলে বোধ হয় পুণ্য বুঝিয়াছিল যে, যেখানে সুরবালার পতি ও পুত্র, তাহার নিকটেও তাহার নিজের এতটুকু স্থান নাই।

মুক্ত আকাশের পাখীকে ধরিয়া খাঁচায় পূরিলে যেমন সে সময়ে সময়ে অতি নিষ্ঠুরভাবে তাহার বন্ধন দশা উপলব্ধি করে, পুণ্যও কিছুদিন পরে বিদেশের কঠোরতা তেমনি নির্ম্মম ভাবে অনুভব করিতে লাগিল। তাহার পল্লীভবনের সেই শান্তি, নদীর ঘাটে কত পরিচিত মুখের হাসি, পালের জোরে নৌকাগুলির সুন্দর লঘু গতি—এ সকলের জন্য ক্রমেই যেন তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিতে

লাগিল। কিন্তু সে কি করিবে? মনে যে ইচ্ছাটি তাহার আসিত তাহা ব্যক্ত করিবার শক্তি হইতে সে যে বঞ্চিত! সুরবালা কখনও কখনও বুঝিত, কিন্তু পুণ্য বাড়ী গেলে কালুকে দেখিবে কে?

(৪)

একদিন সকালে পুণ্যকে আর দেখা গেল না। সুরবালা ভাবিল, এতদিনে পুণ্য তাহার মায়া কাটাইয়াছে। কালু ভাবিল, কি মজা। ললিত একটু বিপদে পড়িলেন। পুণ্যর মত একটি লোক খুঁজিয়া পাওয়া যে কত কঠিন, তাহা তিনি বেশ জানিতেন। পুণ্য হঠাৎ কেন চলিয়া গেল, কোথায় গেল ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে বিমর্ষ ভাবে তিনি আফিস ঘরে গেলেন। দরজা খুলিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, দরজা খোলা রহিয়াছে, ঘরের মেঝেয় একটি লোহার সিন্দুক পোতা ছিল, তাহার চাবি ভাঙ্গা পড়িয়া রহিয়াছে; সিন্দুক হইতে টাকার থলে অদৃশ্য হইয়াছে। তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

বাহিরের ঘরে অস্ফুট চীৎকার শুনিয়া সুরবালা ছুটিয়া আসিল এবং দরজার পাশে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিল। সুরবালাকে দেখিয়া ললিত বলিলেন, "দেখচ? তোমাদের জন্য শেষে হাতে দড়ি পড়লো।"

সুরবালা প্রথমে ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। ললিত

বলিলেন, "এ সেই হতভাগারই কাজ। তোমাদের সুবিধা হবে বলে বেটাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। হতভাগার তিনকুলে কেউ-নেই; আমি সঙ্গে এনে এত দিন খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলাম, বেটা শেষে কি না আমারই সর্ব্বনাশ করলে?"

সুরবালা মৃদুস্বরে বলিল, "দরজা ভেঙ্গে সে কি করে' ঘরে ঢুকবে?" ললিত বলিলেন, "ওঃ তার গায়ে ভয়ানক জোর। আমি ওর চেহারা দেখে আগেই বুঝেছিলাম, ও যা' হ'বে। এতদিন কোন কালে বিদায় ক'রে দিতাম, তা' তোমার জন্যে কিছুতেই পেরে উঠলাম না।"

সুরবালা বলিতে যাইতেছিল যে, সে ত কখনও তাহাকে বিদায় করিতে মানা করে নাই। কিন্তু ভাবিল যে প্রতিবাদের এ সময় নহে। স্বামীর উপস্থিত বিপদ এবং পুণ্যই যে এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এই চিন্তা তাহাকে অত্যন্ত পীড়া দিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "রাণার কাল কোথায় ছিল?"

রাণার রাত্রে ডাকঘরের বারান্দায় শুইয়া থাকিত।

"রাণার বারান্দায় যেমন শোয়, তেমনি শুয়েছিল, আর যেমন শেষ রাত্রে উঠে ডাক আন্‌তে গেছে, আর অমনি বেটা দরজাটি না ভেঙ্গে, কাজ শেষ করে চলে গেছে! উঃ।"

বৃথা বাক্যব্যয়ে কালক্ষেপ না করিয়া ললিত থানায় খবর দিতে গেলেন। সুরবালা ভাবিতে লাগিল। পুণ্য চলিয়া গিয়াছে, সে জন্য তাহার তত দুঃখ ছিল না। সে এমনভাবে দুর্ণামের ডালি মাথায় করিয়া গেল কেন?

নিয়মিত সময়ে রাণার আসিল, পিয়ন আসিল ; কিন্তু পুণ্য আর ফিরিয়া আসিল না। ডাকঘরের চুরির বার্ত্তা শুনিয়া বাজারের দোকানীরা, গ্রামের অধিবাসীরা অনেকে দেখিতে আসিল। সকলে শুনিল মাষ্টার বাবুর যে একটি বোবা জ্ঞাতি দেশ থেকে সঙ্গে আসিয়াছিল, সেই এ কার্য্য করিয়া গিয়াছে। দুই একজন রমণী আসিয়া সুরবালাকে প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিল। কিন্তু সে বেচারী কি উত্তর দিবে ? পুণ্যকে ত সে ভাল করিয়াই জানে। স্বপ্নেও ত সে কখনও ভাবে নাই, যে পুণ্য এমন কাজ করিতে পারে! তাহার মনে পড়িল অনেক দিনের কথা—ললিতের সেই অসুখ ; সেই নদীর ঘাট ; সেই মায়ের নির্ম্মাল্য! সেই নির্ম্মাল্যই ত সে বার ললিতের জীবন রক্ষা করিয়াছিল। পুণ্য কি শেষে এমন খারাপ হইয়া গেল ? এমনি ভাবনায় দিন কাটিয়া গেল।

(৫)

সে রজনীতে তাহাদের কাহারও ভাল ঘুম হইল না। ললিত ভাবিতেছিলেন, তাঁহার চাকরী ত যাইবেই, পাঁচশত টাকার দায়ী হইতে হইবে, উপরন্তু না জেল হয়! সুরবালা কেবল ভাবিতেছিল পুণ্যার জন্য। সে কেন চলিয়া গেল ? যদি যাইবেই, তবে সুনাম রাখিয়া যাইতে পারিল না কেন, তাহার সুখদুঃখের এমন সাথী ত তার কেহ ছিল না! খোকার অসুখের সময়ে পুণ্য প্রাণ দিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিল। সেই পুণ্য এমন করিবে ?

আঙ্গিনার কোলাহলে তাহাদের সে রজনী প্রভাত হইল।

ললিত ব্যস্তভাবে বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, পুণ্যাকে লইয়া দুইজন চৌকীদার এবং কতকগুলি চাষা ডাকঘরের বাহিরে উল্লসিত ভাবে কোলাহল করিতেছে। মাষ্টার বাবুকে দেখিয়া সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পুণ্যাও নিমেষের জন্য সে উল্লাসে যোগদান করিল, কিন্তু তাহার নয়নে যেন একটা সংকোচের ভাব ছিল। পুণ্যা চৌকীদারগণের হস্ত সবলে ছাড়াইয়া ললিতের নিকট ছুটিয়া আসিল। ললিত ত্রস্তভাবে ঘরের মধ্যে গেলেন; চৌকীদারেরা পুনরায় পুণ্যার হস্ত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বেই সে টাকার থলেটি ললিতের দিকে ফেলিয়া দিল। ললিত ক্ষিপ্রহস্তে থলেটি লইলেন এবং দেখিলেন যে তাহার চাবি ও "সিল মোহর" ঠিক আছে।

"তোমরা ওকে থানায় নিয়ে যাও, আমি টাকার থলে নিয়ে আস্‌ছি।" বলিয়া ললিত বাটীর ভিতর আসিলেন।

সুরবালা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিয়াছিল। প্রথমে পুণ্যার হাসিমুখ দেখিয়া তাহার হৃদয় উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, পুণ্যা নির্দ্দোষ। পরে ললিতের কঠোরতায় একটা বিষণ্ণ ভাবে যখন অপরাহ্ণের মেঘের মত পুণ্যার মুখখানি ছাইয়া ফেলিতে লাগিল, তখন সে দুঃখে ও ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিল।

ললিত বাড়ীর ভিতর আসিলে সুরবালা ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ওকে থানায় নিয়ে যেতে বল্লে কেন? বল না।"

ললিত রুক্ষভাবে বলিল, "হাতে হাত কড়ি লাগিয়ে চালান দেবার জন্যে।"

সুরবালার কান্না পাইতেছিল। কিন্তু সে ক্রন্দন চাপিয়া বলিল, "ও ত চুরি করে নাই।"

ললিত কঠোর ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,"তোমাকে কে বল্লে ?"

রুদ্ধ আবেগে, অভিমান ভরে সুরবালা বলিল, "আমার মন বলছে।"

ললিত নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের সহিত বলিলেন, "বিচারের সময় সাক্ষী দিয়ে এস তুমি।"

এইবার সুরবালা কাঁদিয়া ফেলিল। ললিত ধমক দিয়া বলিলেন, "ও কি ? তুমি অমন করে কাঁদ্‌ছ কেন ? কাঁদবার কি হয়েছে ? চোর ধরা পড়েছে, বিচার হবে। দোষী হয় শাস্তি হবে, নির্দ্দোষ হয় খালাস পাবে।"

সুরবালা সামলাইয়া লইয়া বলিল,"ওর কি বিচার হবে ? ও যে নির্দ্দোষ—সে কথাও ত বল্‌তে পারবে না ; প্রমাণ কর্‌তে পারবে না। দোহাই তোমার ! পুণ্যকে থানায় দিও না, ও মরে যাবে।"

"তোমার যে ভারি দয়া দেখ্‌তে পাচ্ছি !" এই বলিয়া ললিত স্কন্ধে একখানি চাদর ফেলিয়া ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে আসিলেন। পুণ্য নির্দ্দোষ হইলেও যে তাহার তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই, এ কথা আগে তাঁহার মনে আসে নাই।

কিন্তু এখন ত তাঁহার কোনও হাত নাই। থানায় যখন খবর দেওয়া হইয়াছে, এবং ঐ ব্যক্তি যখন মালসহ গ্রেপ্তার হইয়াছে, তখন তিনি আর কি করিতে পারেন? মাল যে ব্যক্তির নিকট পাওয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি দোষী নহে, অন্য এক ব্যক্তি দোষী, এ কথা বলা শুধু স্ত্রীলোকেরই সাজে।

তিনি বাহিরে গিয়া দেখিলেন সকলে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। পুণ্য ঘাসের উপর বসিয়া পড়িয়াছে। সে জাগরণে ক্ষুধায় ক্লিষ্ট, অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর, তাহার পায়ের উপরে একস্থান দিয়া খুব রক্ত পড়িতেছিল। ললিত সেখানে যাইবা মাত্র সে ইঙ্গিত করিয়া কাতর ভাবে একবার তাহার সেই ক্ষতস্থান দেখাইয়া দিল। ললিত দেখিলেন, তাহার পায়ের উপরে অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছে, কোনও তীক্ষ্ণ অস্ত্রে কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। পুণ্য অব্যক্ত স্বরে কত কি কহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ললিত কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি শুধু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন।

কিন্তু আর একজন সেই ক্ষত ও রক্ত দেখিয়াছিল,—বুঝিয়াছিল। সুরবালা বুঝিয়াছিল যে চোরের অনুসরণ করিতে গিয়া, সে আঘাত পাইয়া আসিয়াছে। সে বুঝিয়াছিল, কাহার জন্য সে নিজের জীবনের মায়া তুচ্ছ করিয়া চোরের পশ্চাতে গিয়াছিল। একদিন পুণ্য তাহার স্বামীর জীবন রক্ষা করিয়া দিয়াছিল, আর আজ সে তাহার মান সম্ভ্রম ও চাকরী রক্ষা করিয়া দিল। অবিরল ধারায় তাহার অশ্রু প্রবাহিত হইল।

কানের দুল

পুণ্যার চক্ষু দু'টি কেবল সেই চক্ষু দুটির অনুসন্ধান করিতেছিল। একবার নিমেষের জন্য তাহার সাধ পূরিয়াছিল। সে যখন দেখিল যে সে চক্ষু দু'টি করুণায় আর্দ্র, যখন দেখিল সে চক্ষুতে সন্দেহ নাই, তিরস্কার নাই, তখন সে থানায় যাইতে আপত্তি করিল না।

কোঙার সাহেব

চৌরঙ্গীর উপরে বড় গির্জার নিকটে একখানি ছোট অথচ সুসজ্জিত বাড়ীর ফটকে দাঁড়াইয়া একজন মান্দ্রাজী বেয়ারা অনেকক্ষণ এক ট্যাক্‌সির প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার কর্ত্রীও পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার কন্যার চোখে মুখে একটু ব্যস্ততার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। মোটরের 'হর্ণ' শুনিয়া তাঁহারা নামিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু আসিয়া দেখেন যে, তখনও কোনও ট্যাক্‌সি আসে নাই। সাড়ে সাতটার সময়ে বালিগঞ্জে চৌধুরী সাহেবের বাড়ীতে পার্টি আছে। সাতটা বাজিয়া দশ মিনিট হইল, অথচ ট্যাক্‌সি পাওয়া যাইতেছে না। চৌরঙ্গী দিয়া অকারণ ব্যস্ত ভাবে অসংখ্য মোটর গাড়ী আনাগোনা করিতেছে, কিন্তু তাহার একখানিও খালি নহে। মিসেস্ বানার্জি ও মিস্ বানার্জি মাঝে মাঝে ভ্রূকুঞ্চিত করিতেছেন।

গ্যাসের আলোয় মান্দ্রাজী বেয়ারার নিকষ কালো রঙ্গের উপর সাদা পাগড়ীটি পালকের টুপীর মত শুভ্র দেখাইতেছিল, এবং তাহার দুই কানের ক্ষুদ্র কুণ্ডল দুইটিও চিক্‌মিক্ করিতেছিল। মিসেস্ বানার্জি চল্লিশের ভাঙ্গা কোঠায় পা দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ললাটের উপর ঈষৎ শ্বেতাভ অলকদাম ঢেউতরঙ্গ খেলিয়া যাইতে

আজিও অভ্যস্ত ছিল। তাঁহার ফরাসী ক্রেপের শাড়ীর অভ্যন্তর হইতে অতি শুভ্রসুগোল দুখানি হস্ত সরল ভাবে বাহির হইয়াছে; স্থূল অঙ্গুলি গুলি আংটীর হীরক দ্যুতিতে মণ্ডিত। মিস্ বানার্জির বেশভূষাও অনেকটা মায়ের মত। তাঁহার সুগৌর কান্তি বসনের শাসন যথাসম্ভব অতিক্রম করিয়া যৌবনশ্রীর প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিতেছিল। ইংরাজ মেয়েদের ডিনারের পোষাকের স্বল্পতা অনুকরণ করিয়া একটি অতি সূক্ষ্ম সিল্কের জামায় আবক্ষ কোনও রূপে আবৃত করিয়াছেন, এবং তাহার উপর একখানি চিকণ ঢাকাই শাড়ী অনেকটা গাউনের মত করিয়া পরিয়াছেন। উভয়েরই পদে বহুমূল্য (কিড্) ছাগচর্ম্মের বিলাতী জুতা। অজস্র পাউডার উভয়েরই গৌর দেহকান্তিকে বিকট রকমে শুভ্রতর করিয়াছে। উভয়েরই হস্তে স্বর্ণমণ্ডিত হাত পাখা।

হঠাৎ একখানি মোটর শব্দ করিতে করিতে আসিল। মান্দ্রাজী বেয়ারা হাঁকিল, "ট্যাক্‌সি", ট্যাক্‌সি চালক তাহা শুনিতে পাইল কিনা সন্দেহ। কারণ তাহার বেগ কমাইবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। তখন মিস্ বানার্জি একটু অগ্রসর হইয়া হস্ত সঙ্কেতে তাহাকে ডাকিলেন। মোটর বেগ সামলাইতে সামলাইতে কিছুদূর চলিয়া গেল। মিসেস্ ও মিস্ বানার্জি একবার ব্রেসলেটের মধ্যস্থিত ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দ্রুতপদে গাড়ীর নিকটে আসিলেন। চালকের আসনে যে দুইজন বসিয়া ছিল তাহার মধ্যে একজন গাড়ী থামিতেই নামিয়া পড়িল এবং আরোহিণীর জন্য দরজা খুলিয়া দিল। মিসেস বানার্জি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া হাঁফাইতে

লাগিলেন। শরীরের অনাবশ্যক ভারে তাঁহাকে প্রপীড়িত করিয়াছিল। মিস্ বনার্জি উঠিবার সময়ে হঠাৎ গাড়ীর সম্মুখভাগে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "ওম্মা এ কি রকম ট্যাক্সি? এ যে প্রাইভেট কার।"

মিসেস্ বনার্জি "তাই নাকি, তা এ এল কেন?" বলিয়া নামিতে উদ্যত হইলেন। তখন শোফেয়ার বলিল, "নেই নেই মেম-সাহেব, আপ্ কেঁও উংরেঙ্গে? ম্যায় পৌছায় দেউঙ্গা। যো বখ্‌শিশ আপ্‌কা খাহেশ হো, এনায়েৎ করেঁ।"

মিস্ বনার্জি তাহাকে বাঙ্গালী-হিন্দুস্থানীতে বলিলেন, "তোমকো কোন বোলায়া? তুম্ কেঁও আয়া? তোমারা মনীবকো ঠকায়কে য়্যাসা জুয়াচুরী কাম কর্‌তা হায়! অভি তোমার মনীব টের পানেসে তোমকো জেলমে দেগা।"

শোফেয়ার বলিল, "গারি মৎ দীজিয়ে। আপ্‌নে মুঝকো বোলায়া। ইস্ লিয়ে ম্যায় হাজর হুয়া। মেরে মালেকনে ভি এ্যায়সা হি হুকুম কিয়া হায়। অভি আপকা মর্‌জি; কসুর হুয়া কুছ, ত মাফ ফরমাইয়ে, মেমসাব।"

মিসেস্ বনার্জি অবতরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। তিনি আপোষের সুরে বলিলেন, "মিনি, কেন মিছে ঝগড়া কচ্চ? লেডী মিট্‌ফোর্ড হয় ত এতক্ষণ এসে গেছেন। আর এখন ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে, শেষটা যাওয়াই হয় ত হবে না। হলই বা প্রাইভেট্ কার—আমরা ত আর জোর ক'রে উঠ্‌ছিনে। আর ওর মনীব না বল্‌লেই কি ও এমন কাজ

করতে পারে? মনীব হয়ত কোথাও বাইরে গেছেন, ও বেচারী খরচপত্রের অভাবে এমনি ক'রে কোনও গতিকে চালিয়ে দিচ্ছে। ওরই বা অপরাধ কি? তুমি চট্-করে উঠে পড়; ও ত আগে আমাদের পৌঁছে দিক্। তার পরে সে দেখা যাবে এখন।"

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া মিসেস্ বনার্জি একেবারে হাঁফাইয়া উঠিলেন। মিস্ বনার্জি যাই কি না যাই করিতে করিতে চড়িয়া বসিলেন, এবং কতকটা অনুযোগের স্বরে কতকটা প্রশ্নের স্বরে বলিলেন, "তা যেন হল, ভাড়া দিতে হবে কি হিসাবে? মিটার যে নেই!"

শোফেয়ারের দোসর ষ্টার্ট দিতেছিল, এবং শোফেয়ার চাকাটি হাতে লইয়া বেশ ভাল হইয়া বসিতেছিল, সে পিছন দিকে না ফিরিয়াই বলিল, "যো কুছ আপ্‌কী খুসী হো, উও দিজিয়ে।"

শোফেয়ার বাঙ্গলা ভাষা বোঝে দেখিয়া মিসেস্ বনার্জি মনে মনে তারিফ করিলেন; কারণ হিন্দীটা তাঁহার একেবারেই আসিত না। অনেক দিন বেহারে থাকিয়াও তিনি ঐ কটমট ভাষার ধাঁজটা ধরিতে পারেন নাই। তাঁহার মেয়েও যে ঐ 'হোগা' 'যাগা' করে ইহাও তাঁহার একটা বড় পছন্দ হইত না। কিন্তু মেয়ের কাছে তিনি জোর করিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না। মেয়েকে বাড়ীতে মেম রাখিয়া বার বৎসর রীতিমত পড়াইয়াছেন। তারপর লোরেটোতে পাঁচবৎসর পড়িয়া সে একেবারে খাঁটী মেম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মিসেস্ বনার্জির পড়াশুনা বেশী ছিল না, তবে স্বামীর সাহেবিয়ানার পাল্লায় পড়িয়া ঘসিয়া মাজিয়া যাহা কিছু হইয়াছে,

কিন্তু সেটা এখনও তাঁহার মজ্জাগত হইতে পারে নাই। মিসেস্ বনার্জি টেবিলে কাঁটা চামচে ধরিয়া কোনও গতিকে কাজ চালাইতে পারেন। কিন্তু অখাদ্য দেখিলে এখনও তাঁহাকে কাসিতে কাসিতে সারা হইতে হয়। একবার মেয়ের ধমক খাইয়া তিনি অশ্রু-সজল নেত্রে স্বীকার করিয়াছিলেন যে "বামুনের মেয়ের ওসব যা তা খাওয়া কি সয় বাপু? ঐ লাল লাল মাংসগুলো প্লেটে দেখলেই গায়ের ভেতর কেমন যেন করে। ভয় হয় পাছে ন্যাকার করে বসি।"

মিস্ বনার্জি সে কথা শুনিয়া মায়ের প্রতি সেই দিন হইতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। টেবিলে মাকে কাসিতে সুরু করিতে দেখিলেই তিনি জোর করিয়া তাঁহাকে জানালার কাছে পাঠাইয়া দিতেন। সংভোজনকারী ও ভোজনকারিণীদিগকে বলিতেন, "মা আমার হৃদ্‌রোগে অনেক দিন কষ্ট পাচ্ছেন কিনা, তাই ও রকম মাঝে মাঝে হয়। একটু খোলা হাওয়া পেলেই এক্ষুণি ভাল হয়ে যাবেন।" ভাবটা অথচ এই যে, যদি বমি-কমি হইয়া যায়, তবে সেটা টেবিলে ঘটিলেই বিপত্তি ঘটিবে; জানালা থেকে সারিয়া আসাই নিরাপদ।

যাহা হউক, মিস্ বনার্জির ন্যায় শিক্ষিতা বিদুষী, প্রখরা কন্যার চোখে মাতার 'সেকেলে' ধরণের চালচলন বড়ই বিসদৃশ ঠেকিত। মাতাও কন্যার ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া নিজ ত্রুটী ও শিক্ষার অভাব গোপন করিবার সুবিধা পাইতেন। মিসেস্ বানার্জি মনে মনে কন্যার বিদ্যাবুদ্ধির যতই

তারিফ করিতেন, ততই তাঁহার কল্পনার চক্ষুতে একটী খাঁটী সাহেব সিভিলিয়ান জামাইয়ের করমর্দ্দন জনিত আনন্দ ফুটিয়া উঠিত।

দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের গাড়ী চৌধুরী সাহেবের ফটকে প্রবেশ করিল। সেখানে লাটপত্নীর সংবর্দ্ধনা ও ডিনার উপলক্ষে ফটকের উভয় পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত গাড়ী ও মোটর কারের সারি প্রলম্বিত হইয়াছে। অশ্বারোহী সার্জ্জন গাড়ীর সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছে।

মোটর ফটক পার হইয়া গাড়ী বারান্দার ভিতর প্রবেশ করিল। উজ্জ্বল আলোকে বিলাতী পাম ও এরিকা ঝাড়ের গাঢ় সবুজ যেন নীল রেশমী সাড়ীর মত ঝক ঝক করিতেছে। হাস্য কলরবে সে স্থান মুখরিত করিয়া মেয়ের দল বিচিত্র পোষাকের বাহার দিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছেন। চৌধুরী সাহেবের কন্যা ও আত্মীয়ারা অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে নামাইয়া লইতেছেন, গাড়ীগুলি আরোহীদিগকে নামাইয়া দিয়া ফটকের বাহিরে যাইতেছে। বনার্জিদের মোটর গাড়ী বারান্দায় ঢুকিতেই চতুর্দ্দিক হইতে রমণীরা কলকণ্ঠে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। গাড়ী থামিতেই মিস্ চৌধুরী 'এই যে, আসুন মিসেস্ বনার্জি, আসুন মিস্ বনার্জি' বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন, এবং মিস্ বনার্জিকে প্রায় টানিয়া নামাইলেন —তাঁহারা একসঙ্গে লোরেটোতে পড়িতেন। মিসেস্ বনার্জ্জি আস্তে আস্তে পরে নামিলেন। মিস্ বনার্জ্জি মিস্ চৌধুরীর

সহিত কথা কহিতে কহিতে তিন চারিটি সিঁড়ি উঠিয়া গেলেন। শোফেয়ারকে "যো কুছ বখশিশ" দিতে পারিলেন না। মিসেস্ বনার্জিও কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। কন্যা না বলিয়া দিলে, কত দিতে হইবে, তাহা তিনি কি করিয়া ঠিক করিবেন? ইতস্ততঃ করিতে করিতে তিনিও কন্যার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। মিস্ বনার্জি ইচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ী বিদায় করিতে পারিলেন না। একজন ভদ্রলোকের ঘরের গাড়ীতে চড়িয়া আসা কিছু দোষের কথা নয়। কিন্তু তাহাকে ভাড়া দিতে যাওয়া বড়ই কেমন কেমন দেখায়। বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে শোফেয়ারের জুয়াচুরীর সহিত জড়িত হওয়ার লজ্জা মিস্ বনার্জিকে বিব্রত করিয়া তুলিল। বখশিশ হিসাবে কিছু দেওয়া যাইত না যে, এমন নহে, কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দ শোফেয়ার যদি পাঁচ টাকার স্থলে সাত টাকা হাঁকিয়া বসে, তবেই ত সব ফাঁক হইয়া যাইবে। এমনই কিছু ভাবিতে ভাবিতে মিস্ বনার্জি কয়েকটি সিঁড়ি অতিক্রম করিলেন। এমন সময় সশব্দে মোটরের দরজা বন্ধ করিয়া শোফেয়ার উচ্চ স্বরে সিঁড়ির দিকে ফিরিয়া বলিল, "গাড়ী ফাটক্‌কে বাহার ম্যায় লে যাতা হুঁ; আউধ সিং ফাটক্‌মে ঠারেঙ্গে, মেম সাব।"

মিস্ বনার্জি আশ্বস্ত হইয়া, মেমসাহেবনিন্দিত সূক্ষ্ম আওয়াজে বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা।"

কিছু পরেই লাটপত্নী লেডী মিটফোর্ড আসিয়া পড়িলেন। অভ্যর্থনা সঙ্গীত, ঐকতান বাদন, মাল্যদান ইত্যাদি যথারীতি

সম্পন্ন হইল। তারপর খানা আরম্ভ হইল ; সে দিন মিসেস্ বনার্জি সন্দেহক্রমে দু'তিনটা কোর্স প্রত্যাখ্যান করিয়া কাসির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় পার্টি ভাঙ্গিল। লেডী মিট্‌ফোর্ড বিদায় লইবার পরে একে একে অন্যান্য মহিলারাও রওনা হইলেন। মিসেস্ বনার্জি একজন বেয়ারাকে আউধ সিং বলিয়া হাঁকিতে আদেশ করিলেন। আউধ সিং গাড়ী লইয়া আসিল। মিসেস্ ও মিস্ বনার্জি হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া পুনঃ পুনঃ অভিবাদনাদির পর যখন গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন, তখন শোফেয়ার গাড়ীর দরজা বন্ধ করিতে ভুলিয়া মিস্ বনার্জির হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। মিস্ বনার্জি ধমক দিয়া বলিলেন, "কেয়া ? আউর কেৎনা দেরী হ্যায় ? দরজা বন্ করো, আউর ষ্টার্ট দেনে বোলো। তোমরা হুঁস কাঁহা গিয়া ?" একটু ব্যাথ্যার ভাবে ইংরেজিতে মিস্ চৌধুরীকে বলিলেন,

"Just look at the idiot ! As if I was talking to him. Oh, these chauffeurs···"

মিস্ চৌধুরী একটু নিম্ন স্বরে বন্ধুকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "Your face, your face, my dear ; that is to blame."

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে ফটক পার হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বালিগঞ্জের মাঠের পার্শ্বে একবার গাড়ী

খানিকে একটু দাঁড় করাইয়া চুরুটে অগ্নিসংযোগ করিয়া আবার শোফেয়ার গাড়ী চালাইয়া দিল। গমনশীল গাড়ীর প্রতিকূল বাতাসে চুরুটের ধূম ও ভস্ম মিস্ বনার্জির দিকে বাহিত হইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল; তিনি চীৎকার করিয়া গাড়ী থামাইতে বলিলেন এবং শোফেয়ারের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। "এ বহুৎ খারাপ হোতা হ্যায়। হাম্ গাড়ীসে আবি উতার যায়েঙ্গে। খাড়া করো। হাম্ একঠো ট্যাক্সি লেগা।"

শোফেয়ার হাসিয়া বলিল, "বহুৎ আচ্ছা, মেম সাব, ম্যায় আবি উতার দে সক্তা হুঁ। হাম লোগ্ আগর ইয়ে ঠাণ্ডেমে চুরুট না পিঁয়ে, ত কেঁও কর্ কাম্ কর্ সেকেঙ্গে? রাত বহুৎ গুজার গয়ী, খেয়াল কিজিয়ে। আপকী যব খায়েশ হোগী, ত ম্যায় জরুর আপকো উতার দেওঙ্গা। ট্যাক্সি যব তক্ নেহি মিলে গা, তব তক্ ইহাঁ আপ আঁধিয়ারে মে ঠেয়রে রহেঁ, আউর ম্যায় গাড়ী লেকে চলা যাঁউ!"

"আচ্ছা যাও; হাম্‌লোক্ তোমকো বখশিশ কুছ নেহি দেঙ্গে।"

"কুছ পরোয়া নেহি, গরীব পরবর। জল্‌দি এক ট্যাক্সি পাকড় লিজিয়ে, নেহি ত পানি আ যায়েগা, আসমান কী হালৎ দেখিয়ে, ক্যা ঘটা ঘোর হ্যায়।"

মিসেস্ বনার্জি গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া একবার আকাশের অবস্থা দেখিয়া লইলেন। পশ্চিম দিকে মেঘের উপর

সম্পন্ন হইল। তারপর খানা আরম্ভ হইল; সে দিন মিসেস্ বনার্জি সন্দেহক্রমে দু'তিনটা কোর্স প্রত্যাখ্যান করিয়া কাসির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় পার্টি ভাঙ্গিল। লেডী মিট্‌ফোর্ড বিদায় লইবার পরে একে একে অন্যান্য মহিলারাও রওনা হইলেন। মিসেস্ বনার্জি একজন বেয়ারাকে আউধ সিং বলিয়া হাঁকিতে আদেশ করিলেন। আউধ সিং গাড়ী লইয়া আসিল। মিসেস্ ও মিস্ বনার্জি হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া পুনঃ পুনঃ অভিবাদনাদির পর যখন গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন, তখন শোফেয়ার গাড়ীর দরজা বন্ধ করিতে ভুলিয়া মিস্ বনার্জির হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। মিস্ বনার্জি ধমক দিয়া বলিলেন, "কেয়া? আউর কেৎনা দেরী হ্যায়? দরজা বন্ করো, আউর ষ্টার্ট দেনে বোলো। তোমরা হুঁস কাঁহা গিয়া?" একটু ব্যাখ্যার ভাবে ইংরেজিতে মিস্ চৌধুরীকে বলিলেন,

"Just look at the idiot! As if I was talking to him. Oh, these chauffeurs..."

মিস্ চৌধুরী একটু নিম্ন স্বরে বন্ধুকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "Your face, your face, my dear; that is to blame."

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে ফটক পার হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বালিগঞ্জের মাঠের পার্শ্বে একবার গাড়ী

খানিকে একটু দাঁড় করাইয়া চুরুটে অগ্নিসংযোগ করিয়া আবার শোফেয়ার গাড়ী চালাইয়া দিল। গমনশীল গাড়ীর প্রতিকূল বাতাসে চুরুটের ধূম ও ভস্ম মিস্ বনার্জির দিকে বাহিত হইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল; তিনি চীৎকার করিয়া গাড়ী থামাইতে বলিলেন এবং শোফেয়ারের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। "এ বহুৎ খারাপ হোতা হ্যায়। হাম্ গাড়ীসে আবি উতার যায়েঙ্গে। খাড়া করো। হাম্ একঠো ট্যাক্সি লেগা।"

শোফেয়ার হাসিয়া বলিল, "বহুৎ আচ্ছা, মেম সাব, ম্যায় আবি উতার দে সক্তা হুঁ। হাম লোগ্ আগর ইয়ে ঠাণ্ডেমে চুরুট না পিঁয়ে, ত কেঁও কর্ কাম্ কর্ সেকেঙ্গে? রাত বহুৎ গুজার গয়ী, খেয়াল কিজিয়ে। আপকী যব খায়েশ হোগী, ত ম্যায় জরুর আপকো উতার দেওঙ্গা। ট্যাক্সি যব তক্ নেহি মিলে গা, তব তক্ ইহাঁ আপ আঁধিয়ারে মে ঠৈয়রে রহেঁ, আউর ম্যায় গাড়ী লেকে চলা যাঁউ!"

"আচ্ছা যাও; হাম্লোক্ তোমকো বখশিশ কুছ নেহি দেঙ্গে।"

"কুছ পরোয়া নেহি, গরীব পরবর। জল্দি এক ট্যাক্সি পাকড় লিজিয়ে, নেহি ত পানি আ যায়েগা, আসমান কী হালৎ দেখিয়ে, ক্যা ঘটা ঘোর হ্যায়।"

মিসেস্ বনার্জি গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া একবার আকাশের অবস্থা দেখিয়া লইলেন। পশ্চিম দিকে মেঘের উপর

মেঘের স্তর বেশ জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেলিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন কালো বোর্ডের গায়ে খড়ি দিয়া কষি টানিয়া দিতেছে। তিনি আসন্ন বিপদের পরিমাণ বুঝিয়া মেয়ের গা টিপিয়া দিলেন। বলিলেন, "বাপু, ওরা ছোট লোক, একটু আধটু চুরুট না খেলে বাঁচবে কেন?"

শোফেয়ার তরজমা করিয়া সায় দিল, "হাঁ হুজুর কীস্তরে বাচোঙ্গা।"

"তোমার বড় বাড়াবাড়ি, মিনি। আচ্ছা, তুমি এদিকে এসে ব'স। আমি ঐ দিকে যাচ্ছি। কেমন, তা হ'লে ত হবে?"

তাহা না হইলেও হইত; কেন না শোফেয়ার যখন ধমক খাইয়া দমিল না, তখন মিস্ বনার্জি একটু নরম কাটিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মাতার কৃপায় সব দিক্ রক্ষা হইল। শোফেয়ার ঈষৎ হাসিয়া একবার আরোহিণীদ্বয়কে দেখিয়া লইল।

কিছু পরেই চৌরঙ্গীর আলোক দেখা গেল, এবং বনার্জি মহিলারা বাড়ীর ফটকে অবতীর্ণ হইলেন। মিস্ বনার্জি ব্যাগটি খুলিয়া একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিলেন, এবং স্মিত মুখে জিজ্ঞাসিলেন "কেৎনা দেনে হোগা?"

শোফেয়ার "দোচার রূপেয়া—যো আপকী খুসী," বলিয়া সেলাম করিল।

মিসেস্ বনার্জি চট্ করিয়া কন্যার হাত হইতে নোট খানি

আত্মসাৎ করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, "Change হ্যায়?" শো:ফয়ার মাথা নাড়িল। তখন মিসেস্ বনার্জি উপায়ান্তর না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল আবার আসতে পার? কাল আমাদের শ্যামবাজারে ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে, সাতটায় বেরুব। আসতে পারবে, বাপু?"

শোফেয়ার ইঙ্গিতে সঙ্গীকে 'ষ্টার্ট' দিতে বলিয়া একবার কলটা পরীক্ষা করিয়া লইতে লইতে বলিল, "কাঁহে নেই সেকেঙ্গে?"

মিসেস্ বনার্জি একটু হাসির রসে কথা গুলিকে ভিজাইয়া বলিলেন, "তবে কালই তোমার ভাড়া নিও। কেমন?"

শোফেয়ার দীর্ঘ হস্তে সৈনিক প্রথায় সেলাম ঠুকিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া চাকা ঘুরাইয়া দিল। গাড়ী ধীরে ধীরে চৌরঙ্গীর রাস্তা বাহিয়া চলিয়া গেল। মিস্ বনার্জি উপেক্ষাভরে সে দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। মিসেস্ বনার্জি পশ্চাতের বসনপ্রান্ত ধূলি হইতে সামলাইতে কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িলেও গাড়ীর দিকেই বার বার চাহিয়া দেখিলেন। তার পর যখন গাড়ী দৃষ্টি সীমা ছাড়াইয়া গেল, তখনও শোফেয়ারের বলিষ্ঠ অথচ সুকুমার গঠন ভাবিতে ভাবিতে উপরে উঠিয়া গেলেন।

তার পর দিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বনার্জি সাহেবের ড্রয়িং-রুমে সেই মান্দ্রাজী বেয়ারা আসিয়া খবর দিল, "মোটর আয়া।" মিসেস্ বনার্জি হাঁচিতে হাঁচিতেও উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

মিস্ বনার্জি মাতাকে তদবস্থ দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইলেন। পার্শ্বে একখানি বেতের চেয়ারে মিঃ হুই বসিয়াছিলেন। তিনি কিছু না বুঝিতে পারিলেও হাঁটুতে দুই তিনবার চপেটাঘাত করিয়া সেই সঙ্গে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। মিস্ বনার্জি হাসির মধ্যে পুনঃ পুনঃ থামিয়া বলিলেন,—

"ও! সেই—সেই মোটরকার—যার কথা আপনাকে বল্‌ছিলুম —সেই কালকার adventure মিঃ হুই।"

"My goodness" বলিয়া মিঃ হুই একেবারে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন।

"কেমন মিঃ হুই—এটাকে একটা adventure বই আর কি বলা যেতে পারে? চাইচি ট্যাক্সি; এল একটা প্রাইভেট মোটর—কি মজা বলুন ত!"

"মজা ব'লে মজা। ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য।" বলিয়া মিঃ হুই পুনরায় হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িলেন। মিঃ হুই একজন ব্যারিষ্টার, এবং মিস্ বনার্জির পাণিপ্রার্থীদিগের অন্যতম। সম্প্রতি তাঁহারই পালে জোর বাতাস ব'হতেছিল। রায়, গুহ ও শাশমল সাহেবেরা একরূপ বুঝিয়া ফেলিয়াছেন যে, তাঁহাদের মানব জন্ম এ যাত্রা বিফলে গেল। বিজয় গৌরবে মিঃ হুইয়ের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

মিসেস্ বনার্জি বলিলেন, "দেখ পিয়ারী, লোকটা কিন্তু খাঁটী। আমরা চৌধুরীর বাড়ীতে নেমে তাদের অভ্যর্থনায় এমন বিব্রত হ'য়ে পড়লাম যে, তখন ভাড়া দিতে যাওয়া কেমন

vulgar ঠেকতে লাগল। তারা এক দিক থেকে 'আসুন আসুন, আস্তে আজ্ঞা হোক' ব'লে এগিয়ে, হাত ধ'রে টানছে, আর ওদিকে তুমি ব্যাগের ভেতর থেকে সিকিটা দুয়ানিটা পর্য্যন্ত খুঁটে তুলে ভাড়া চুকিয়ে দিতে গেলে, এ সত্যিই বড় কেমন কেমন দেখায়, নয়? তুমিই বল দিকিনি। তার পরে আবার সত্যি কথা বল্তে কি, একটু বাধো বাধোও ঠেকলো। প্রাইভেট্ মোটরে চ'ড়ে গেছি, ও যেন ঠিক নিজেদের 'কার'। ওকে ভাড়া দিতে কি বকশিশ দিতে গেলে অভিনয়টা যেন মাটী হয়ে যায়। কে কি মনে করবে, ভাব দেখি! আমরা ইতস্ততঃ করচি, আমার ত বাপু পা আর উঠে না। মিনি ত টপ্ টপ্ ক'রে উঠে গেল। কিন্তু শোফেয়ারটা কি ভদ্রলোক— সে তক্ষুণি সেটা বুঝে নিলে, বল্লে, আমি ফটকের বাইরে গাড়ী রাখছি, আউধ সিং ফটকে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। পাছে আমরা ওর 'কার' ঠিক ক'রে উঠতে না পারি; নম্বর ত জানি না—তাই আমাদের সম্মানে আঘাত না লাগে, এমন ভা'বে বুঝিয়ে দিয়ে গেল, গাড়ীটা আবার কি করে খুঁজে নিতে হবে।" মিসেস্ বনার্জি হাসিতে লাগিলেন।

মিস্ বনার্জি মাতার উচ্ছ্বাসটি সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারিতেছিলেন না। মিষ্টার হুইকে মাতা যেমন আত্মীয় মনে করিয়া নিজদের গোপন কথা সব বলিয়া ফেলিতেছেন, কন্যা তাঁহাকে এখনও ততটা আত্মীয় মনে করিতে পারেন নাই। প্রাইভেট্ কারে চড়িয়া সান্ধ্য ভোজনে যাওয়ার মধ্যে এমন একটি

অপরাধের আভাস ছিল, যাহার জন্য তাঁহার মাথা হেঁট্ করিতে হইতেছে। সেই জন্যই মিস্ বনার্জি একটু অন্যমনস্ক হইবার ভান করিয়া একখানি বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বক্ষে ঘড়ি-ব্রোচটি ঠিকমত আটকাইয়া দিতেছিলেন। আয়নায় নিজের ঢল ঢল পরিপূর্ণ পাউডার-চর্চ্চিত মুখখানি দেখিয়া যে একটু আত্ম-প্রসাদের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আর কেহ না দেখিলেও মিষ্টার হুই সতৃষ্ণভাবে দেখিয়া লইয়াছিলেন। মিস্ বনার্জি ভাবিলেন, আমি কি সুন্দরী; মিষ্টার হুই ভাবিলেন "এত আমারই; আজ না হয়, দুদিন পরে।"

মিসেস্ বনার্জির এক মাত্র চেষ্টা ছিল, কথার জাল ফেলিয়া মিষ্টার হুইকে গ্রেপ্তার করা। তিনি যে পিয়ারীকে তাঁহার কন্যার খুব উপযুক্ত ভাবী বর বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহা মোটেই নয়। তবে সিবিলিয়ান বা ঐরূপ কোনও মনোমত ব্যক্তি উপস্থিত না থাকায়, এবং হুইয়ের প্রতি কন্যার পক্ষপাতপ্রসন্ন দৃষ্টি দর্শনে মিসেস্ বনার্জি হুইকে যথারীতি উৎসাহ দান করিতেছিলেন।

ঘড়ীতে মৃদু গম্ভীর সুরে সাতটা বাজাইয়া দিল। মিস্ বনার্জি বলিলেন, "তা হলে মিঃ হুই—"

মিষ্টার হুই বলিলেন, "চলুন না, আপনাদের গাড়ীতে তুলে দি। আমি অমনি মাঠে একটু বেড়িয়ে ট্রোকাডেরোতে গিয়ে উঠবো।"

হুই সাহেব রাত্রের আহারটা ঐস্থানে সম্পন্ন করিয়া বিলাতী অভ্যাস ও সাহেবী চাল কথঞ্চিৎ বজায় রাখেন।

মিসেস্ বনার্জি একটু বেশীমাত্রায় হাঁচিতে আরম্ভ করিলেন। মিষ্টার হুই উঠিয়া পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু হাঁচির বাধা পাইয়া সোফার উপর একবার ধাঁ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই তিনি লাফাইয়া উঠিয়া হাত বাড়াইয়া মিসেস্ বনার্জিকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। মিসেস্ বানার্জি হাঁচিয়া হাঁচিয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি তিনি ভাবী জামাতার বাহু অবলম্বন করিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আবার তাঁহাকে হাঁচিতে আক্রমণ করিল। কন্যা জানিতেন যে, মাতার এইরূপ অবস্থায় নড়া চড়া করা বিপজ্জনক হইতে পারে। তিনি বলিলেন—

"মাম্মি, তোমার শ্যামবাজারে আজ গিয়ে কাজ নেই। আজ weather টাও ভাল নয়, হয়ত এখনই বৃষ্টি নাম্‌বে। তোমার শেষটা ঠাণ্ডা ফাণ্ডা লেগে একটা অসুখ হতে পারে। থাক্, আমি তোমার হয়ে তাঁদের গিয়ে বল্‌ব এখন।"

মিসেস্ বনার্জি একটু আশ্বস্ত হইয়া নিকটস্থ একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার শারীরিক দৌর্ব্বল্য, তিনি কন্যা ও ভাবী জামাতার নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কন্যার বিরক্তির আশঙ্কায় তিনি বলিয়া উঠিতে পারেন নাই যে তাঁহার পক্ষে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হইবে। মিষ্টার হুইয়ের তত্ত্বাবধানে মেয়েকে ছাড়িয়া দিয়া বনার্জি গৃহিণী নিশ্চিন্ত হইলেন। উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যেরূপ আকর্ষণ তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সঙ্গ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া যে তাহারা একত্র

ভ্রমণ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিবে না, এই স্বাভাবিক অনুমানের আশ্রয় লইয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন।

মাতাকে সাবধানে থাকিতে বলিয়া মিস্ বনার্জি বক্ষপার্শ্বে লগ্ন ঘড়িটি উল্‌টাইয়া একবার সময় দেখিয়া লইলেন, পর মুহূর্ত্তেই মিষ্টার হুইকে ইঙ্গিত করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

ফটকের নিকটেই গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। মিস্ বনার্জিকে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আসিতে দেখিয়া সোফেয়ার কিছুক্ষণ সেই দিকেই চাহিয়া ছিল। সে তাহার মুখের চুরুটটি অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায়ই ফেলিয়া দিল। আউধ সিং ষ্টার্ট দিয়াছিল; গাড়ীখানি ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল। মিস্ বনার্জি বিদায় লইবার জন্য হুই সাহেবের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। মিঃ হুই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে করপল্লব পেষণ করিয়া বলিলেন,

"আমিও আসি না? আপনি একলা যাবেন, আমি আপনাকে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে আসতে পারি না কি?"

"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, মিষ্টার হুই। আপনি শুধু আমাকে হেফাজৎ করবার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করতে চাইচেন। কিন্তু একেবারেই তার কোনও প্রয়োজন নেই; আমি পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একলাই travel কর্‌তে পারি; তাতে কারও সাহায্যের দরকার করে না। আপনি কি মেয়েদের কখনও একলা যেতে দেখেন নি? Bye bye, Mr Hui."

বলিয়া আপনার হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া মিস্ বনার্জি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। মিঃ হুই সবেগে হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক ধাবমান

গাড়ীর দিকে পুনঃ পুনঃ সঙ্কেত করিলেন। কিন্তু আউধ সিং ব্যতীত কেহই তাহা লক্ষ্য করিল কিনা সন্দেহ।

মিসেস্ বনার্জির হাঁচির গতিকেই হউক, বা যে কারণেই হউক, আজ যাত্রাটা তেমন ভাল ছিল না। শোফেয়ার আজ উন্মাদ বেগে গাড়ী ছুটাইয়া দিয়াছে। তাহার সুনিপুণ হস্তের কৌশলে গাড়ীখানি স্রোতের টানে হাল্কা সোলার মত পিচ্ছিল পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ভয়ানক গুমোট হইতেছে। দুরন্ত বেগশীল গাড়ীতে বসিয়াও মিস্ বনার্জি হস্তস্থিত পাখা দ্রুত সঞ্চালন করিতে ছিলেন। শোফেয়ার তাহা লক্ষ্য করিয়া, হঠাৎ চাকা ঘুরাইয়া দিল এবং একেবারে মাঠের মধ্যে কাশুরিণা বর্ত্মে আসিয়া পড়িল।

পূর্ব্বে গাড়ী এত বেগে চলিতেছিল যে, মিস্ বনার্জির মেম সাহেবনিন্দিত সাহসও টলিয়া যাইতেছিল, সুতরাং কাশুরিণার মৃদুমন্দ হাওয়ার মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে বেগ যথন কিঞ্চৎ শিথিল হইল, তথন তিনি প্রতিবাদ করিলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়া গাড়ী ষ্ট্র্যাণ্ডে পড়িল। গঙ্গাবিধৌত শীতল বাতাসের স্পর্শ লাভ করিয়া মিস্ বনার্জি ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। পশ্চিমাকাশে বিদ্যুৎ বিকাশ হইল, গঙ্গার বক্ষ সে আলোকে শীতল গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত হইল। মিস্ বনার্জি বলিলেন, "ইধার কেঁও আয়া? শ্যামবাজার কা রাস্তা দোসরা হ্যায়। তুম্ ক্যা নিন্দ যাতা?"

শোফেয়ার বিনয়ের সহিত বলিল, "নেহি হুজুর, ইস্ রাস্তে ভি যা সেক্তে। উশ্ রাস্তেমে ত ভিড় হ্যায়।"

"নেই নেই, হামারা দেরী হো যায়েগা; তুম্ জল্‌দি সিধা রাস্তাসে লে চলো।"—বলিয়া মিস্ বনার্জি একবার গ্যাসের আলোয় বক্ষঃস্থিত ঘড়ি দেখিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। শোফেয়ার তাঁহার ব্যর্থ চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া একটি 'সুইচ' টানিয়া দিল। গাড়ীর ভিতরের দুই তিনটা আলো একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। মিস্ বানার্জি দেখিলেন যে, ৭টা বাজিয়া মাত্র ১৫ মিনিট হইয়াছে। তিনি শোফেয়ারকে আজ ভাল মত পুরস্কার করিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিলেন।

গাড়ী নিমতলা দিয়া চিৎপুরে প্রবেশ করিয়াছে। ভিড়ের ভিতর দিয়া সাবধানে গাড়ী অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময় শোফেয়ার ও আউধ সিং যুগপৎ "আহা হা" শব্দ করিয়া উঠিল, এবং গাড়ী থামাইয়া দিল; এক খানি মোটর দ্রুতবেগে পাশ দিয়া চলিয়া গেল।

শোফেয়ার নামিয়া পড়িল, এবং পকেট হইতে নোট-বই বাহির করিয়া জিজ্ঞাসিল, "কেৎনা নম্বর হ্যায়, আউধ সিং?"

আউধসিং বলিল, "দো হাজার চার শ' তেয়তাল্লিস্।" শোফেয়ার লিখিয়া লইল। মিস্ বনার্জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্যা হুয়া?"

শোফেয়ার জবাব দিল না। আউধসিং বুঝাইয়া দিল যে আর একখানা মোটরে মানুষ চাপা দিয়াছে। মিস্ বনার্জি দেখিলেন, রাস্তার উপর একটা জড়পিণ্ডের মত কি পড়িয়া রহিয়াছে।

শোফেয়ারের ইঙ্গিতে আউধ সিং ও ছুটিয়া গেল, এবং দুজনে ধরাধরি করিয়া সেই মৃতপ্রায় দেহ গাড়ীর নিকটে লইয়া আসিল। পুলিসও আসিয়া জুটিল। শোফেয়ার বলিবার পূর্ব্বেই মিস্ বানার্জি গাড়ী হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ; সেখানে এক একটি করিয়া লোক জমিতেছিল।

শোফেয়ার বিনা বাক্যব্যয়ে আহত ব্যক্তিকে গাড়ীর ভিতরে গদীর উপরে শোয়াইয়া দিল। আউধ সিং ও কনেষ্টবল গাড়ীর ভিতরেই বসিল। শোফেয়ার মিস্ বনার্জিকে সম্মুখের দিকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া নিজে অপর দিক হইতে উঠিয়া বসিল। তখন ইতস্ততঃ করিবার সময় ছিল না ; আর একটি প্রাণীর এই আকস্মিক মৃত্যুসঙ্কটে মিস্ বনার্জি ডিনারের কথা তখনকার মত ভুলিয়া গেলেন।

শোফেয়ার আউধ সিংকে মেডিক্যাল কলেজের রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়া গাড়ী ঘুরাইয়া দিল। অনতিবিলম্বে মেডিক্যাল কলেজের গাড়ীবারান্দার নিম্নে মোটর প্রবেশ করিলে, শোফেয়ার নামিয়া গেল, এবং হাঁসপাতালের বাহকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া আহতকে ধীরে ধীরে লইয়া গেল। মিস্ বনার্জি জিজ্ঞাসিলেন, "বহুৎ দেরী হোগা ?"

"নেহি সাব" বলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে শোফেয়ার চলিয়া গেল। মিস্ বনার্জি আউধ সিংকে গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন ; ইচ্ছা যে, গাড়ীর ভিতরে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসা যাক্ ; কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, তিনি

পড়িতে পড়িতে, গাড়ীর হুড্ ধরিয়া কোনও গতিকে রক্ষা পাইলেন। গাড়ীর গদী, ফুটবোর্ড, ভিতরের পা-দানী সব রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে শোফেয়ারের আসনে গিয়া বসিলেন।

শোফেয়ারের ফিরিতে বিলম্ব হইল। মিস্ বনার্জি পুনঃ পুনঃ ঘড়ি দেখিতে লাগিলেন। শেষে যখন আধঘণ্টাও অতীত হইতে চলিল, তখন একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। ডিনারের জন্য তত নহে; যে সকল ঘটনা পরম্পরার ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন এই গত কয়েক মিনিট ধরিয়া চলিতেছে, তাহার তুলনায় ডিনার কিছুই নয়। একাকী অপরিচিত লোকের সঙ্গে সমস্ত কলিকাতাটা প্রদক্ষিণ করা; তার পর চক্ষুর সমক্ষে মোটর দুর্ঘটনা; গাড়ীর মধ্যে রক্তের ঢেউ; ডিনারের আনন্দ কোলাহলের পরিবর্ত্তে হাঁসপাতালের রোগীর অব্যক্ত আর্ত্তস্বর; তার পর—তার পর সেইটি একটু লজ্জার বিষয়, একজন অপরিচিত হিন্দুস্থানী অথবা শিখ যুবকের সঙ্গে একাসনে উপবেশন—এ যে গল্প করিবার মত ব্যাপার। এ যে কোনও মেমসাহেবের পক্ষে গর্ব্ব করিবার মত adventure! মিস্ বনার্জির মনে মেমসাহেব ও adventure—এ দুইটি জিনিস এতই কাছাকাছি যে, একটিকে বাদ দিলে আর একটির কিছুই থাকে না।

বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। মধ্যে মধ্যে আকাশ ভুবন বিদীর্ণ করিয়া বজ্রনাদ হাঁসপাতালের বৃহৎ অট্টালিকা কাঁপাইয়া প্রতিধ্বনি তুলিতেছে। মিস্ বনার্জি পুনরপি ঘড়িটি ফিরাইয়া

দেখিলেন। শোফেয়ার আসে না কেন? লোকটি কিন্তু খুব পরোপকারী। সে এত করিতে না গেলেও ত পারিত। চাপা দিলে একজন, বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়েছে আর এক জন। মিস্ বনার্জি দেখিয়াছিলেন যে, আহত ব্যক্তি একটি বাঙ্গালী যুবক। বাঙ্গলী যুবকের জন্য পাঞ্জাবী শোফেয়ারের এত কি দায় পড়িয়াছিল? সত্যই শোফেয়ারটি খাঁটি লোক। গরীব মানুষ, পরের চাকরী করিতেছে। কিন্তু তবুও তাহার ভিতরে প্রাণ আছে। পঞ্জাবের মানুষগুলা সবই কি এর মত? পঞ্জাবের লোকগুলা বেশ সুন্দর হয় কিন্তু। শোফেয়ারের দেশে সে বোধ হয় খুব সুন্দর। এর বোধ হয় বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এর স্ত্রীও বোধ হয় খুব সুন্দরী। আহা এর স্ত্রীর কত কষ্ট। এমন স্বামী ছাড়িয়া থাকা—সেই কোন্ দূর দেশে। কি করিবে বেচারা? কাজ না করিলে খাইবে কি?

মিস্ বনার্জি একটি ছোট রকমের দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া শোফেয়ারের স্ত্রীর উদ্দেশে সমবেদনা প্রকাশ করিলেন। আউধ সিং সিঁড়ির দিকে চাহিয়া সঙ্গীর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। মিস্ বনার্জি বলিলেন, "আউধ সিং, দেখ না জি, শোফেয়ার ক্যা কর্‌তা হ্যায়। হামারা ত টাইম্ হো গিয়া।"

আউধ সিং ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সামরিক রীতিতে অভিবাদন করিল, এবং "হামেরা গাড়ী ছোড়কে যানে কা হুকুম নেহি হ্যায় হুজুর।" বলিতে বলিতে গাড়ীর নিকটে আসিল।

"আউর গাড়ী, ট্যাক্সি, আউর ঘোড়াগাড়ী কুচ্ মিল সক্তা হিঁয়া ?

"হিঁয়া কাঁহা মিলে গা, এৎনা পানিমে ?"

"তাইত—বহুত মুস্কিল কী বাত হ্যায়।"

একটু পরেই সময় কাটাইবার উদ্দেশ্যে মিস্ বনার্জি আউধ সিং এর সহিত কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কাজটা ঠিক মেম সাহেবের মত হয়ত হইল না। কিন্তু মিস্ বনার্জির অদ্ভুত চরিত্র সব সময়ে অপরের অনুকরণ করিতে অক্ষম।

"আচ্ছা, আউধ সিং, তোম লোককা ঘর কাঁহা ?"

"পিণ্ডীমে।"

মিস্ বনার্জি মনে মনে তাহারও জলপিণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন, "লাহোর কে পাছ ?"

"লাহোরসে থোড়ী দূর উত্তর তরফ হ্যায়।"

"শোফেয়ার তোমারা ভাই হ্যায় ?"

"হামারা মনীব হ্যায়, সাব।"

মিস্ বনার্জি মনে করিলেন, তাই ত, আউধ সিং গাড়ীর সহিস মাত্র। শোফেয়ারের আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্য সে ত বটেই।

"ঘরমে শোফেয়ার কো কোই হ্যায় ?"

"হাঁ হুজুর, উনকো বাপ হ্যায় আউর মা হ্যায়।"

"সাদি হুয়া হ্যায় ?"

প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়া মিস্ বনার্জি লজ্জিত হইয়া পড়িলেন;

কিন্তু তাঁহার সে লজ্জারক্ত বদন মণ্ডল কেহ দেখিতে পাইল না বলিয়া শীঘ্রই সামলাইয়া লইলেন।

"নেহি মেম সাব।"

এমন সময় কলরব করিতে করিতে রেসিডেণ্ট সাহেব ডাক্তার, দু'তিন জন কলেজের ছাত্র আসিয়া গাড়ী খানিকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন। তাঁহাদের সকৌতুক দৃষ্টি বনার্জিকন্যাকেও বিব্রত করিয়া তুলিল। ডাক্তার সাহেব গাড়ীর নম্বর ও ঠিকানা ইত্যাদি টুকিয়া লইলেন।

মিস্ বনার্জি একটু বিস্মিত হইতেছিলেন। শোফেয়ার ডাক্তার সাহেবের সব কথাগুলির উত্তর বেশ সপ্রতিভ ভাবে ইংরাজিতে দিতেছিল। তাহাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কারণ, অনেক যুবক ইংরাজি লেখাপড়া কিছু শিখিয়া মোটর চালকের কাজ করে। কিন্তু এমন বিশুদ্ধভাবে, এমন সুরে ইংরেজি কথা যে একজন সাধারণ পাঞ্জাবী যুবক কহিতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণায় কখনও আসে নাই।

রেসিডেণ্ট ফিজিশিয়ান সাহেবের অনুমতি লইয়া শোফেয়ার গাড়ী চালাইয়া দিল।

মিস্ বনার্জির মনে হইল, শোফেয়ার তাঁহার বড় কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়াছে। তিনি একটু ভাল হইয়া, একটু সোজা হইয়া বসিয়া শোফেয়ারের সংস্পর্শ দোষ এড়াইবার চেষ্টা করিলেন।

মিস্ বনার্জি বলিলেন, "আবি আট বাজ গিয়া; হামারা বহুৎ দের্ হুয়া।"

কানের ভুল

"কুছ পরওয়া নেহি ; দো মিনিটমে পঁহুচায় দেউঙ্গা" বলিয়া শোফেয়ার গাড়ী ছুটাইল।

বৃষ্টি তখনও থামে নাই। মিস্ বনার্জির পিঙ্ক রঙের বেনারসী শাড়ী বর্ষায় ভিজিয়া সাদা দেখাইতেছিল। কালীতলার মোড়ে আসিয়া গাড়ী হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। কারবোরেটারে জল ঢুকিয়া আগুন নিবাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং গাড়ী সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মিস্ বনার্জি ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনও উপায় কি নাই ?"

"না কোনও উপায়ই নাই ; অত্যন্ত দুঃখিত।"

শোফেয়ারের স্বরে দুঃখের কোনও চিহ্ন বুঝা গেল না। এবং একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক যেন তাহার চোখে মুখে খেলিয়া গেল। শোফেয়ার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, বৃষ্টির ধারায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল। সে মিস্ বনার্জির বসন আর্দ্র হইবার আশঙ্কায় যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হইয়া বসিল। বর্ষার ধারা তাঁহার গায়েও শলাকার মত প্রবেশ করিতেছিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার রক্তকে ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারিল না। নূতন রকমের কিছু হইলেই মিস্ বনার্জির রক্ত তালে তালে নাচিতে থাকিত। সুতরাং আশঙ্কা ও অসুবিধার গুরুত্বের অনুপাতে মিস্ বনার্জির কৌতূহলের মাত্রা বাড়িয়াই যাইতেছিল। পল্লীগ্রামে তাঁহার পিতার সহিত প্রথম প্রথম পাখী ও খরগোস শিকার করিতে যাইতে তিনি আমোদ বোধ করিতেন। দু'চারবার চেষ্টার পর যখন হাতের লক্ষ্য ঠিক

হইয়া গেল, তখন আর ঘুঘু, সজারু, খরগোস, শিকার করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না। বাঘ ভালুক পাইলে বরং সেখানে যা তে তাঁহার আমোদ হইত; কিন্তু বাঘ-ভালুক সব সময়ে দুর্ভাগ্য-ক্রমে মিলে না।

শোফেয়ার পকেট হইতে চুরটের বাক্স বাহির করিয়া মিস্ বনার্জির দিকে চাহিয়া আজ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার আপত্তি আছে কি?"

মিস্ বনার্জি শুধু ঘাড় নাড়িলেন। শোফেয়ার চুরুট ধরাইয়া তাহার ধূমে আপনাকে কিছুক্ষণ নিমজ্জিত করিয়া দিল। মিস্ বনার্জি কল্পনা করিতে চেষ্টা করিলেন, সে কি ভাবিতেছে। বোধ হয়, তাহার বিপদের কথা ভাবিতেছে। তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইয়াই তাহার যত বিপদ। কিন্তু সে ত তাহার জন্য টাকা পাইবে। তবুও মিস্ বনার্জি সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে লইয়াই যে সে বেচারী এই দুর্য্যোগের মধ্যে পড়িয়াছে, এই চিন্তা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পীড়া দিতে লাগিল। পরক্ষণেই তিনি ভাবিলেন যে, এক হিসাবে তাহার তেমন দুঃখের কারণ নাই। সামান্য এক জন মোটর গাড়ীর চালক তাঁহার মত এক জন সম্ভ্রান্ত, বিদুষী, রূপসী বঙ্গ-মহিলার পার্শ্বে বসিতে পাইয়া নিশ্চয়ই অন্ধকার সন্ধ্যার ভ্রমণ হইতে এমন একটি মাধুর্য্যের স্মৃতি সঞ্চয় করিয়া লইতেছে—যাহা তাহার সারা জীবনে একটা বিপুল আনন্দের প্রবাহ বহাইবে। মিস্ বনার্জির রূপের অভিমান ছিল,—সকল রমণীরই থাকে; এবং মিস্ বনার্জি একটি চোখের কোণে দেখিতে

পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার রূপের প্রভাব গরীব শোফেয়ারের প্রতি একেবারে ব্যর্থ হয় নাই।

ঘণ্টা কয়েক পরে জল কমিয়া গেলে অনেক কষ্টে মোটরের উদ্ধার সাধন করিয়া লইয়া শোফেয়ার মিস্ বনার্জিকে বাড়ীতে পঁহুছিয়া দিল। মিস্ বানার্জি ২০ টাকার দুখানা নোট তাহাকে দিতে গেলে সে দীর্ঘ সেলাম করিয়া বলিল, "বখশিস চাহি, মেমসাব।"

মিস্ বনার্জির নিকট কুড়ি টাকার অধিক ছিল না; তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া প্রসন্নমনে অভিবাদন করিয়া শোফেয়ার গাড়ী চালাইয়া দিল। বলিয়া গেল, "কাল সাম কো লেগা।"

পরদিন মিস্ বনার্জির চায়ের পার্টি বেশ জমিয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধ মিঃ বনার্জি আফিস হইতে সকাল সকাল ফিরিয়া, কন্যার বন্ধুগণকে সংবর্দ্ধনা করিতে ব্যস্ত ছিলেন। মিসেস্ বনার্জির হাঁচি কমিয়া গিয়া হাঁফানিতে পরিণত হইয়াছিল। তিনি এক খানি কুশন চেয়ার দখল করিয়া দুই সাহেবকে আতিথেয়তাসূত্রে উচ্ছ্বসিত ভাবী শ্বশ্রূস্নেহের পূর্ব্বাস্বাদ দিতে দিতে নিজেই কয়েক পেয়ালা চা ও কেক বিস্কুটের সৎকার করিতেছিলেন।

খানসামা মিস্ চৌধুরী, মিস্ বোস প্রভৃতির দিকে পুনঃ পুনঃ চায়ের ট্রে বাড়াইয়া দিয়া আপ্যায়িত করিতেছিল। মিস্ বোস্‌কে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে চকলেট তুলিয়া লইতে দেখিয়া

মিস্ বনার্জি ছুটিয়া আসিলেন, এবং দু'তিন রকমের কেক তুলিয়া লইতে তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

মিস্ বোস্ বলিলেন, "আমি ত তোমার নেমন্তন্ন রাখ্‌তে আসিনি ; শুধু দেখ্‌তে এসেছি তোমার কোনও অসুখ করেচে কি না। কাল তুমি যাও নি দেখে আমি ভাব্‌লুম যে, নিশ্চয়ই তোমার ব্যামো ট্যামো কিছু হয়েছে।"

মিস্ বনার্জি পুনশ্চ দুঃখ প্রকাশ করিয়া কাতর ভাবে বলিলেন, "আমি তোমার ডিনারে যাব ব'লে যে রকম অসুবিধা কাল ভোগ করেছি, তা জীবনে কথনও ভুলবো না। একবার ভাব দেখি, চোখের উপর মোটরে মানুষ চাপা পড়ল, আর সেই মানুষকে আমরা মোটরে তুলে হাঁসপাতালে নিয়ে এলুম—মোটরে রক্তের বন্যা বয়ে গেল—এতে মনে কর কোনও মেয়ের nerve হলেও দমে যেত! তোমার বাড়ীতে পেয়ালা পিরীজের ঠুন্ ঠুন্ শব্দে আর রোষ্টকারীর গন্ধে তোমাদের হল যখন ভরপূর, তখন we were roughing it out in the streets, the poor chauffeur and I."

সকলে অবাক হইয়া মিস্ বনার্জির উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। মিস্ চৌধুরী চাপা গলায় বলিলেন, "মিনি, তোমার সেই শোফেয়ার না'কি, যে সেদিন তোমার মুখ দেখে অজ্ঞান হয়েছিল?"

মিস্ বনার্জি তাঁহাকে একটি কিল দেখাইয়া ও ভ্রুভঙ্গী করিয়া শাসন করিলেন। মিষ্টার ঘুই একটু অস্থির হইয়া উঠিলেন

মিষ্টার রায় ও মিষ্টার শাশমল হুইয়ের নিকটে মুখ আনিয়া বলিলেন, "Buck up, old chap"

মিস্ বনার্জি আবেগের সহিত গত রজনীর ঘটনা বিবৃত করিলেন। সকলে বিস্ফারিত নেত্রে মিস্ বনার্জির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিসেস্ বনার্জি পূর্ব্ব হইতেই হুইয়ের কর্ণ কুহরে শোফেয়ারের সুখ্যাতির তীব্র আরক ঢালিয়া দিতেছিলেন। হুই আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কাল অমন ভাবে ঐ একটা পাঞ্জাবী ভূতের সঙ্গে আপনার যাওয়া উচিত হয় নি—ও লোকটার বিটকেল চেহারা দেখেই আমার মেজাজ বেজায় বিগড়ে গেছ্‌লো—তা নইলে আমি আপনার সঙ্গে কাল যেতুম, আপনাকে একলা কোনও ক্রমে ঐ হতভাগাটার সঙ্গে যেতে দিতাম না।"

মিষ্টার শাশমল কাছেই বসিয়া ছিলেন। তিনি হুইয়ের কানে কানে বলিলেন, "Bravo, our Knight Templar!"

মিস্ বনার্জি মিঃ হুইকে রাগাইবার জন্য বলিলেন, "এ দেশে এমন অনেক প্রেত আছে, যাদের চেয়ে পাঞ্জাবের ঐ ভূতটি অশেষ গুণে ভাল।" শাশমলের উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখুন, মিষ্টার শাশমল, সত্যি অমন আর এক জনও শোফেয়ার আপনি দেখেন নি। কাজ করে যাচ্ছে, অথচ মুখে কথাটি নেই। শক্তির সীমা নেই, অথচ সংযম আছে। পুলিসকে দুই ধমকে সিধে ক'রে দিলে, আবার আহতকে কত যত্ন করে নিজের গাড়ীতে নিয়ে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে

এল। আমাদের মত সভ্যতার বার্ণিশ ওর না থাকতে পারে, কিন্তু ও লোকটা একটি সত্যিকার রক্তমাংসওয়ালা মানুষ। অসভ্য বর্ব্বর হ'তে পারে, কিন্তু ওর হৃদয় আছে। ভাবুন, মুষলধারে বৃষ্টি পড়্ছে—কালীতলার মোড়ে এক হাঁটু জল জমে গেছে—তার মাঝে মোটর আট্‌কে গেছে, রাস্তার আলো প্রায় সব নিভে গেছে, এই অবস্থায় আমি তার সঙ্গে তিন তিনটি ঘণ্টা একলা কাটাতে বাধ্য হয়েছিলুম; কিন্তু তাতে আমার একটুও কষ্ট বা অসুবিধা সে হতে দেয় নি। বেচারী একটা চুরুট ধরাবে, তাও আমার অনুমতি না নিয়ে কর্‌বে না।"

মিষ্টার হুইয়ের সহিত রায়, শাশমল প্রভৃতির একবার চোখো-চোখি হইয়া গেল। মিসেস্ বনার্জির বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে শোফেয়ারের গুণপনা আরও অতি-রঞ্জিত করিয়া গল্প করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। খানসামারা চায়ের সরঞ্জাম সরাইয়া লইতেছে এবং আইসক্রিম পরিবেশন করিতেছে, এমন সময় বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল, "মোটর আয়া।"

সকলে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিলেন। মিস্ বনার্জি বলিলেন, "ওঃ, সেই মোটর এসেছে। কাল ওকে টাকা দিতে গেছ্‌লুম—তা ও বখশিশ চাইল। আমার কাছে বেশী টাকা ছিল না, আর রাত্রি তখন ১টা। কে আবার তখন বখশিস্ আন্‌তে যায়—আমি তাই ওকে আজ আস্‌তে বলেছিলুম।"

মিঃ বনার্জি বেয়ারাকে বলিলেন, "যাও, মোটরওয়ালাকে সেলাম দাও। মিনি, আমি ওকে বখশিশ কর্‌বো। তোমা

এত রাত্রে ভালয় ভালয় পৌঁছে দিয়েছে, এর জন্য আমি ওকে নিজে ধন্যবাদ দিতে চাই। তুমি যতক্ষণ না ফিরে এলে, ততক্ষণ আমি কাল রাত্রে ঘুমোতে পারিনি।"

মিসেস্ বনার্জি প্রতি কথায় ঘাড় নাড়িয়া অনুমোদন করিলেন।

শোফেয়ার দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, পরদার লেসের ভিতর হইতে তাহার মুখের কতকাংশ দেখা যাইতেছিল! সে মিসেস্ বনার্জির দিকে চাহিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। খাকীর শর্টের উপর খাকীর একটা শার্ট ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। গলার বোতাম না থাকায় মাংসপেশীবহুল বক্ষ ঈষৎ উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পায়ে স্থূল বুটের উপর পটি জড়ান। যুবকের সর্ব্বাঙ্গে পরিপূর্ণ যৌবন ও স্বাস্থ্য যেন উথলিয়া পড়িতেছিল। তাহার দৃষ্টি সকলকে অতিক্রম করিয়া মিষ্টার হুইয়ের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল।

বনার্জি সাহেব বুক পকেট হইতে একখানি নোট কেস্ বাহির করিলেন, এবং তাহার মধ্য হইতে কয়েকখানি নোট লইয়া তাঁহার স্ত্রীর হস্তে দিলেন; বলিলেন, "ননী, তুমি ওকে দাও। আমা অপেক্ষা তোমার দেওয়া পুরস্কার ও বেশী সম্মানের ব'লে মনে করবে।"

ইহাতেই মুস্কিল বাধিল, মিসেস্ বনার্জির পক্ষে আসন ত্যাগ করিয়া অতটা যাওয়া শ্রমসাপেক্ষ। বনার্জি সাহেব আগে কথাটা ভাবিয়া দেখেন নাই। তিনি পত্নীর উঠিবার ব্যর্থ চেষ্টা

দেখিয়া লজ্জিত হইলেন এবং বিনা আড়ম্বরে দরজার নিকট গিয়া শোফেয়ারকে টানিয়া তাঁহার নিকট লইয়া আসিলেন। মিসেস্ বনার্জি সস্মিত মুখে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার হাতের মধ্যে নোটগুলি গুঁজিয়া দিলেন। সে গম্ভীর ভাবে অভিবাদন করিল। মিস্ বনার্জি হাস্যমুখে তাহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন। হুই সাহেব ত রাগে গর্‌গর্ করিতে লাগিলেন। তিনি আইস্‌ক্রিমের কাচপাত্র ও চামচে সশব্দে টিপয়ের উপর ফেলিয়া ইংরেজিতে বলিয়া উঠিলেন, "কি যে মিছে হৈ চৈ আপনারা কচ্চেন, তার ঠিকানা নেই। কাল ও যা করেচে, তার জন্যে এক বাণ্ডিল নোটের পরিবর্ত্তে ঘোড়ার চাবুকের ব্যবস্থা কর্‌লেই সুব্যবস্থা হ'ত। ও একটা জানোয়ার। এক জন ভদ্র মহিলাকে গন্তব্য স্থানে পোঁছে না দিয়ে সারা সহর ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে—মিস্ বনার্জিকে অনর্থক সারা রাত কষ্ট দিয়েছে—engagement রাখ্‌তে দেয় নি, তাকেই আবার আস্কারা দিয়ে আপনারা একেবারে মাথায় তুলচেন। এর বখশিশ্ দেবার ব্যবস্থাটা আমার উপরে দিলে ভাল হ'ত।" বলিয়া হুই সাহেব শোফেয়ারের দিকে কট্‌মট্ ভাবে চাহিয়া রহিলেন—ভাবটা এই যে, এখনই উহাকে হাতে হাতে পুরস্কার দিতে পারিলেই ভাল হইত।

মিস্ বনার্জি লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন, এবং হুইয়ের ব্যবহারে অত্যন্ত চটিয়া গেলেন।

শোফেয়ার সকলের দিকে চাহিয়া দেখিল। তার পর নোটের তাড়া হুয়ের মুখের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া স্পষ্ট ইংরাজিতে বলিল:

"আচ্ছা মহাশয় তাহাই হউক, পুরস্কারের ভার আপনার হস্তেই রহিল। আমি নীচে আপনার জন্য অপেক্ষা করিব, একখানি ঘোড়ার চাবুকও ভাল দেখিয়া যোগাড় করিয়া রাখিব। কি বলেন? বিদায় ভদ্র মহিলাগণ, বিদায় ভদ্র মহোদয়গণ; আমার গোস্তাকি মাফ্ করবেন।"

শোফেয়ার গর্ব্বিত পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ছুই সাহেব অপমানের জ্বালায় তত না হউক, আপাততঃ চোখের জ্বালায় একটু বিব্রত হইয়া উঠিলেন। নোটের তাড়া তাঁহার চোখে আসিয়া লাগিয়াছিল। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ চোখে রুমাল দিতে দেখিয়া অনেকেই মুখে রুমাল দিয়া একটু হাসিয়া লইলেন।

মিষ্টার ছুই থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "ভদ্র লোকের গৃহ মন্দিরের ন্যায় পবিত্র; ঐ এক গুণ্ডার সহিত গুণ্ডামি করিয়া ত মিষ্টার বনার্জির গৃহ কলঙ্কিত করিতে পারি না।"

মিষ্টার বনার্জি শোফেয়ারের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, এবং তিন চার মিনিট পরে আবার তাহাকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। একখানি বেতের চেয়ার তাহার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"Please take this chair. Ladies and Gentlemen, allow me to introduce to you the Koer Saheb of Balakot."

মিস্ চৌধুরী বলিলেন, "ইনি বালাকোটের কোঙার সাহেব?"

মিস্ বোস্ বলিলেন, "তাই ত, সেদিন কুচবিহারের বাড়ীর

এঁকে দেখেচি যে! কুচবিহার টিমের সঙ্গে ক্রিকেট্ খেল্‌তে এসেছেন—ইনি যে একজন বিখ্যাত ক্রিকেটার।"

মিষ্টার বনার্জি বলিলেন, "হাঁ তিনিই।"

মিসেস্ বনার্জি হাঁচিতে আরম্ভ করিলেন। তথাপি তিনি মিষ্টার হুইকে ঠেলিয়া দিলেন,

"পিয়ারী, ক্ষমা চাও, ক্ষমা চাও। তুমি ওঁকে ভারি অন্যায় বলেছ।"

মিষ্টার হুই আরক্ত বদনে টলিতে টলিতে তাঁহার নিকট গিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। কোঙার সাহেব গর্ব্বিত ভাবে তাঁহার কর মর্দ্দন করিয়া হাসিলেন।

মিষ্টার বনার্জি বলিলেন, "আমি উঁহার সহিত করমর্দ্দন করিতে গিয়াই বুঝিলাম যে, উনি আমারই ন্যায় একজন ফ্রি মেসন, Grand Lodgeএর Member. তখন লোক ঠাওর কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি যে কে উনি! তারপর ওঁর গাড়ীতে মোনো-গ্রাম দেখে আর ওঁর সঙ্গে আলাপ করে ওঁর পরিচয় পেলুম। তবে শোফেয়ারের ভূমিকাটা একটু আশ্চর্য্যের বটে!"

মিষ্টার বনার্জির এই প্রচ্ছন্ন তিরস্কারে কোঙার সাহেব সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কি বলিবেন, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় মিস্ বনার্জি আইস্‌ক্রিম্, কেক প্রভৃতি স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিয়া তুলিলেন। মিসেস্ বনার্জি অতি কষ্টে আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কোঙার সাহে

প্রথমতঃ আপত্তি করিলেন। কিন্তু মিস্ বনার্জ্জি বলিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুত বখশিশ না দিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। কাজেই কোঙার সাহেবকে আহারে বসিতে হইল।

তার পর চেয়ার হইতে উঠিয়া মিস্ বনার্জ্জিকে সৈনিক প্রথায় সেলাম করিয়া কোঙার সাহেব বলিলেন, "গাড়ী হাজির হ্যায়, মেমসাব!"

সকলেই হাসিতে লাগিলেন। মিস্ বনার্জ্জি "আভি হাম আতা" বলিয়া ছুটিয়া অন্যঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একটী ছাতা ও রুমালের ব্যাগ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "হাম, তৈয়ার হ্যায়, শোফেয়ার।"

অন্যান্য নিমন্ত্রিতেরাও গৃহে যাইবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়াছিলেন। মিস্ বনার্জ্জির সহিত সকলে নামিয়া গেলেন। ফটকের ধারে একখানি প্রকাণ্ড Rolles Royce car অপেক্ষা করিতেছিল। মিস্ বনার্জ্জি বন্ধু বান্ধবকে তাঁহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, কোঙার সাহেবের সহিত সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইলেন। আজ উভয়েই ভিতরে বসিলেন। আউধসিং শোফেয়ারের বদলী কাজ করিল।

* * * * *

সেবারে সীমান্তের টিম্ ভাল খেলিতে পারিল না, এবং সে জন্য খেলোয়াড়রা মনে মনে চটিয়া যাইতে পারিল না; কারণ, তাহাদের সর্ব্বজনপ্রিয় ক্যাপ্টেনের ভাগ্যে বধূলাভ হওয়ায় তাহারা "অল্ ওয়া কাপ" না পাওয়ার দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছিল।

কল্যাণী

বৃদ্ধ রামকিঙ্কর ভট্টাচার্য্যের ভাগ্য নিতান্তই মন্দ বলিতে হইবে। পাঁচজনের কুচক্রে পড়িয়া চাকরীটি হারাইলেন—সে আজ দশ বৎসরের কথা। দুঃসময়ের একমাত্র সঙ্গিনী ব্রাহ্মণী ছিলেন, তিনিও বিদায় লইলেন, বৎসর যাইতে না যাইতে এক-মাত্র কন্যা, সে-ও চলিয়া গেল। সারা জীবন বিদেশে ঘুরিয়া রামকিঙ্কর সমাজের স্নেহ-রসধারা হইতে বঞ্চিত ছিলেন; তারপরে চাকরী হইতে বিচ্যুত হইয়া পল্লীভবনে বাস করিতে গেলেন, তখন সমাজের সহিত তাঁহার বনিল না। সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যদি বা তিনি কলিকাতায় বাস করিতে আসিলেন, সেখানেও বিধাতার দণ্ড তাঁহার অনুসরণ করিতে ত্রুটী করিল না। উপার্জ্জনক্ষম পুত্র বিনারোগে একদিন ফাঁকি দিয়া গেল। এইরূপে যখন বৃদ্ধের সংসার-বন্ধনগুলি একে একে খুলিয়া যাইতে-ছিল, তখন একটি ক্ষুদ্র শিশুর কোমল বাহু তাঁহার গলদেশে এমন একটি মমতার ফাঁস পরাইয়া দিল, যাহা খুলিয়া ফেলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল।

রামকিঙ্করের পুত্র যখন কালগ্রাসে পতিত হইলেন, তখন কল্যাণীর বয়স মাত্র একমাস। এই এক মাসের শিশুটিই বৃদ্ধের সমস্ত জীবনের সম্বল হইয়া দাঁড়াইল। পুত্রবধূ সারাদিন গৃহকর্ম্ম

লইয়া থাকিত ; বৃদ্ধ সারাদিন তাঁহার শিশু-কন্যার পরিচর্য্যায় রত থাকিতেন। জগৎ যত জোরে তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিত, তিনি তত জোরে এই শিশুটিকে বক্ষে চাপিয়া ধরিতেন। বিধাতার এমনই খেলা যে মায়ার বন্ধনগুলি যত কাটিতে থাকে, ততই অবশিষ্ট বন্ধনগুলি আরও নাগপাশের মত জড়াইয়া ধরে। রাম-কিঙ্করেরও তাহাই হইল ; সংসারের সমস্ত মায়ার বন্ধন কাটাইয়াও শেষে এই ক্ষুদ্র মেয়েটির অস্ফুট মধুর সম্ভাষণে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তারপর একদিন তিনি স্বহস্তে যে স্নেহের পাশ রচনা করিতেছিলেন, বিধাতা তাহাকে আরও দৃঢ়তর করিয়া দিলেন—পুত্রবধূটীও সরিয়া পড়িল। তখন কল্যাণীর বয়স তিন বৎসর।

এই তিন বৎসরের বালিকাকে লইয়া রামকিঙ্করের দীর্ঘ দিন-মানগুলি যে কি ভাবে কাটিত, তাহা সেই বৃদ্ধ ও তাঁহার অন্তর্য্যামী দেবতা ব্যতীত আর কেহ জানিত না। সমস্ত দিন বালিকাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, তাহার সহিত হাসিয়া খেলিয়া, গল্প করিয়া একরূপে চলিয়া যাইত। কিন্তু তারপর যখন কল্যাণীকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল, তখন আর বৃদ্ধের দিন কাটিতে চাহিত না। কল্যাণী যখন কাছে থাকিত, তখন তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া বৃদ্ধ একরূপে সময় কাটাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু প্রভাতে স্কুলের গাড়ী আসিয়া যখন তাহাদের দরজায় হাজির হইত, তখন হইতে বৃদ্ধের কর্ম্মহীন জীবনে বাদলের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত।

কল্যাণী কাল কি কাপড় পরিয়া স্কুলে যাইবে, কোন জামাটি পরিলে ভাল মানাইবে, স্কুল থেকে আসিয়া কি খাইবে, এই ভাবনায় রামকিঙ্করের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। ঝি চাকরের উপর তিনি এসব বিষয়ে কোনওমতে নির্ভর করিতে পারিতেন না। কল্যাণীর প্রত্যেক শাড়ীখানি, প্রত্যেক জামাটি দেরাজের মধ্য হইতে বাহির করিয়া, আবার তাহাকে ঝাড়িয়া গুছাইয়া অন্ততঃ তিনটিবার পাট করিয়া না রাখিলে বৃদ্ধের সোয়াস্তি হইত না। এমনই করিয়া তাঁহার একান্ত নিঃসঙ্গ জীবন কাটিত।

কল্যাণীর গৃহ শিক্ষার ভার একজন পণ্ডিতের উপর অর্পিত হইল। এই পণ্ডিতটি রামকিঙ্করের প্রতিবেশী। পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত রামকিঙ্করের আলাপ হইয়াছিল বীডন্ উদ্যানে। উভয়েই প্রায় সমবয়স্ক। পণ্ডিত মহাশয় অল্পদিন হইল বেথুন স্কুলের শিক্ষকতা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। রামকিঙ্কর তাঁহাকে বলিবামাত্রই তিনি তাঁহার পৌত্রীর শিক্ষার ভার লইতে সম্মত হইলেন। সেই হইতে উভয়ের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা হইতে লাগিল। কল্যাণীর প্রসঙ্গ পড়িলেই স্বভাবতঃ অল্পভাষী রাম-কিঙ্করের মুখে যেন খই ফুটিত। পণ্ডিত বলিতেন

"দেখুন ভট্চাজ মহাশয়, আপনার নাত্নীটি যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী।" (বারান্তরে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী)

রামকিঙ্কর তখনই উৎফুল্ল হইয়া বলিতে আরম্ভ করিতেন, "কি জানেন বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, ওর মা ছিলেন চণ্ডীপুরের

নীলাম্বর চাটুজ্যের মেয়ে। অনেক খুঁজে পেতে ছেলের বিবাহ দিয়েছিলাম। নীলাম্বর চাটুজ্যের খুল্লপিতামহ সেকালকার জুনিয়ার সিনিয়ার পাশ সদরালা ছিলেন।"

এইরূপে কল্যাণীর কথায় উভয়ের অনেক সময় বেশ কাটিয়া যাইত। এই পণ্ডিত মহাশয়ের পরামর্শেই রামকিঙ্কর পৌত্রীকে বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন।

পড়াশুনায় পৌত্রীর আগ্রহ দেখিয়া বৃদ্ধের আগ্রহও বাড়িয়া যাইত। তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া কল্যাণীর পাঠের ব্যবস্থা করিতেন। ঠাকুরদাদার স্নেহাভিষিক্ত যত্নের গুণে সে ক্লাশে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া জলপানি পাইয়াছিল। রামকিঙ্কর আনন্দে অধীর হইলেন এবং আরও উৎসাহের সহিত তাহার পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ করিলেন। ইতিমধ্যে কবে কোন এক বসন্ত প্রভাতে কল্যাণী যে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল, তাহা বৃদ্ধের খেয়াল হইল না। তাঁহার দেশের সমাজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, ইচ্ছা করিলেও সে সমাজে আর তাঁহার ফিরিবার উপায় নাই। নূতন সমাজে প্রবেশ করিতে হইলেও পুরাতন পরিচয়ের প্রয়োজন। এই সকল ভাবিয়া কল্যাণীর বিবাহের বিষয়ে রামকিঙ্করের বড় আগ্রহ ছিল না। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ও তাঁহাকে বুঝাইতেন, এ সময়ে কল্যাণীর বিবাহ দিলে, লেখাপড়ায় ব্যাঘাত পড়িবে। কিন্তু এমন মেধাবিনী বালিকার বিদ্যাশিক্ষার অন্তরায় হওয়া অকর্ত্তব্য। পরন্তু ইহাও বিচিত্র নহে যে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাহার ইচ্ছামত পাত্র আপনা হইতেই

আসিয়া জুটিতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে বিবাহের ব্যয়ও অধিক লাগে না।

অর্থ ব্যয় করা রামকিঙ্করের সহজসাধ্য ছিল না। তাঁহার আজীবন সঞ্চিত অর্থের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহার দ্বারা কল্যাণীকে মনোমত পাত্রে সম্প্রদান করা অসম্ভব। কিন্তু সে চেষ্টা অপেক্ষাও বৃদ্ধের আর একটা অতি নিভৃত চিন্তা ছিল এই, কল্যাণীকে ছাড়িয়া জীবন কি বহে ?

এই সকল কারণে রামকিঙ্কর দেখিয়াও দেখিলেন না যে কল্যাণীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে নব দূর্ব্বাদলের কোমল কান্তি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার আয়ত নয়ন সহজেই আনত হইয়া আসিত। যৌবনের প্রথম উন্মেষে যেমন তাহার স্বাস্থ্য-শ্রীসম্পন্ন দেহলাবণ্য বসন্ত বাতাহতি কম্পিত কুসুমদলের মত হিল্লোলিত হইয়া উঠিল, তেমনই লজ্জার তরুণারুণরাগ তাহার কপোলে গণ্ডে ক্ষণে ক্ষণে আবীরের শোভা বিধান করিতে লাগিল।

এমনই একদিনে তাহার মনটি অকস্মাৎ চুরি গেল। তখন সে বি-এ পড়ে। পুঁথিতে কেতাবে প্রেমের অনেক কথা সে পড়িয়াছে, এবং সঙ্গিনীদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও হঠাৎ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে দেখিয়াছে। কিন্তু রমণীর জীবনে প্রেমের আলোক এমনই অকস্মাৎ একদিন যে বিদ্যুদ্দামের মত চকিতে চমকিয়া উঠে, তাহা সে কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু সত্য সত্যই সে তাহার মন একদিন হারাইয়া দিয়া বসিল।

রামকিঙ্কর তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি তখন অসুস্থ; জ্বর কিছুতেই ছাড়িতে চাহিতেছিল না দেখিয়া কল্যাণী ভীত হইয়া পড়িল এবং পণ্ডিত মহাশয়কে ধরিল যে, একজন ভাল ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিতে হইবে। পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র কিছুদিন পূর্ব্বে ডাক্তারী পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে; তিনি প্রথমতঃ তাহাকেই একবার দেখানো স্থির করিলেন। মনসিজ পিতার নিকট শুনিয়া রামকিঙ্করকে দেখিতে আসিল। পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে কল্যাণী অনেকবার ইহার সম্বন্ধে শুনিয়াছে, কিন্তু কখনও দেখে নাই। মনসিজও জানিত যে রামকিঙ্কর বাবুর পৌত্রী বেথুন কলেজে পড়ে এবং তাহার পিতার যত্নেই সে এতদূর শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু প্রতিবেশী হইলেও ইহার পূর্ব্বে আর কখনও সে এ বাড়ীতে আসে নাই। আজ সে কল্যাণীকে প্রথম দেখিল, ধীরভাবে তাহার মুখে রোগীর অবস্থা শুনিল, তাহার ছল ছল চোখ দুইটি যে আবেদন ভরা দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপিত করিল, তাহা তাহার মর্ম্মস্থল স্পর্শ না করিয়া পারিল না। সে ঔষধ লিখিয়া, আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া গেল। ভিজিট দিবার সময়ে কল্যাণীর হাত বুঝি একটু কাঁপিয়াছিল, আবার কখন আসিবেন এই প্রশ্নটি করিবার সময় বুঝি তাহার চক্ষু দুইটি মাটির দিকে আনমিত হইয়া পড়িয়াছিল। মনসিজ ঈষৎ হাসিয়া ভিজিট্ প্রত্যাখ্যান করিয়া গেল এবং বিকালে নিশ্চয়ই আবার আসিবে এই প্রতিশ্রুতিও দিয়া গেল। কল্যাণী ভাবিল এত মিষ্টিও কি মানুষ হয়!

২

রামকিঙ্কর সত্বর ভাল হইলেন বটে ; কিন্তু কল্যাণীর হৃদয়ে যে দাগ পড়িয়া গেল, তাহা আর উঠিল না। এখন সে আর ডাক্তার মুখার্জ্জির সহিত বড় একটা সংকোচ করিয়া কথা কহে না। রামকিঙ্করও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। ডাক্তার যে এত মিষ্ট ব্যবহার করিতে পারে, ইহা তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। বিদ্যাবাগীশ আসিলেই তিনি শতমুখে তাঁহার পুত্রের প্রশংসা করিতেন। বিদ্যাবাগীশও তাহাতে গর্ব্ব অনুভব করিতেন। তাঁহার পুত্র কোন কোন্ বিষয়ে অনার্ পাইয়াছে, মেডেল পাইয়াছে, সাহেব ডাক্তারের সুখ্যাতি পাইয়াছে, তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতেন। আর কল্যাণী সে সব শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। তাহাদের ডাক্তার মুখার্জি যে কালে একজন প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার হইবেন, ইহা সে বলিতে কুণ্ঠিত হইত না।

কিন্তু একটি বিষয়ে সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না, ডাক্তার মুখার্জি এতদিন বিবাহ করেন নাই কেন? পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট সে শুনিয়াছে যে অনেক বড় বড় লোক কন্যা লইয়া তাঁহাকে সাধিতেছে। সে পুনঃ পুনঃ তাঁহার মুখে শুনিতে ভালবাসিত যে মনসিজ বিবাহ করিবে না সংকল্প করিয়াছে। কেন যে এ সংবাদটি সে শুনিতে ভালবাসিত, তাহা সে নিজেই

জানিত না। তবে কোনও প্রসঙ্গে এ কথা উঠিলে সে একবার করিয়া বলাইয়া লইত, যে মনসিজ বিবাহ করিতে রাজি নহে।

একদিন সে মনসিজকে বড়ই মুস্কিলে ফেলিল। মনসিজ রামকিঙ্করকে দেখিতে আসিত; তাঁহার সেই জ্বর হওয়া অবধি একটা না একটা কিছু অসুখ লাগিয়াই ছিল। মনসিজও প্রায়ই আসিয়া দেখিয়া যাইত। একদিন রামকিঙ্করকে দেখিতে আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কেমন আছেন, কর্তা?"

"আর কেমন? এখন যেতে পারলেই হয়।"

"সে কি! এখনও যে আপনার অনেক কাজ বাকী রয়েছে। এখন ছুটি কি পাওয়া যায়?"

"ঠিক বলেছ ডাক্তার! আমার এখনও কাজ বাকী আছে। কল্যাণীর একটা ব্যবস্থা না হলে' আমার মরেও শান্তি হবে না, বাবা।"

"হাঁ, ওর একটা বে' থা দিয়ে ঘর সংসার পাতিয়ে দিলে, তখন আপনার ছুটির দরখাস্ত সম্বন্ধে বিবেচনা করা যেতে পারবে, বুঝেছেন?"

কল্যাণী পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধিতেছিল। সম্মুখে দেয়ালের গায়ে একখানি বড় আয়না; সেই আয়নায় মনসিজের মুখের ছায়া পড়িয়াছিল। তাহার বিবাহের কথা বলিবার সময় ডাক্তার অমন করিয়া মুখখানি সরাইয়া লইল কেন, কে জানে? সে বেণী বিনাইতে বিনাইতে ভাবিতে লাগিল।

রামকিঙ্কর বাবুর নিকট বিদায় লইয়া মনসিজ কল্যাণীর ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। আয়নায় তাহার পূর্ণ প্রতিবিম্ব পড়িতেই কল্যাণী তাহার দিকে ফিরিল; দেখিল, ডাক্তারের চোখে মুখে যেন একটা আনন্দের তরঙ্গ খেলিয়া গেল; কেন? ডাক্তার কি দর্পণে তাহার এলাইত বেণী দেখিয়া খুসী হইয়াছে? তাহার ত রূপ নাই; সে যে কালো! কত সুন্দরী, সুন্দরী কন্যা মনসিজকে কামনা করিয়া বসিয়া আছে, তাহাদের কাছে সে কি দাঁড়াইতে পারে? এমনি কত চিন্তা তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে একটা তুমুল কোলাহল তুলিয়া দিয়া গেল। মনসিজ কথা কহিল—

"আপনার ঠাকুরদাদা ত দেখ্‌ছি, আপনার জন্যে ভেবে ভেবে অস্থির। এত ভাব্‌লে ত শরীর টিক্‌বে না। এর একটা ব্যবস্থা করুন।"

ডাক্তারের স্বরে একটু কৌতুকের ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল। কল্যাণী তাহাদের কথাবার্ত্তা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। সুতরাং সে লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। ডাক্তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়াই রহিল।

কল্যাণী বলিল, "কেন এত ভাবেন, কে জানে?"

"আপনার জন্যেই ভাবেন।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ আপনার একটা বিবাহ দিতে পারলেই—"

"আপনি কি ডাক্তারী ছেড়ে ঘটকালী ধরলেন শেষটা, ডাক্তার মুখার্জ্জি?"

"তা মন্দ কি? মনে করেছি ত দিন কতক ঘটকালীটাই দেখা যাক্। কি বলেন?"

"সেটা নিজের সম্বন্ধে করলে সময়ের আরও সদ্‌ব্যবহার হ'তে পারে।"

"আমার বিবাহের কথা বল্‌ছেন?"—ডাক্তার হাসিয়া ফেলিল।

কল্যাণী বলিল, "আমি যে শুধু কথাটাই বল্‌চি, তা নয়। আমি সত্যিই ঘটকালী কর্‌ব মনে মনে স্থির করে রেখেছি; দেখুন ডাক্তার মুখার্জ্জি, আমাদের সঙ্গে নীহার বলে, একটি মেয়ে পড়ে। সে এমন সুন্দরী, সে আর আপনাকে কি বল্‌ব! আপনার সঙ্গে যদি তার বে হয়, ত কি সুন্দরই মানায়। আপনার ঠিক যোগ্য মেয়ে সে: কাল আমি পণ্ডিত মহাশয়কে বল্‌ব ভেবেছি।"

হঠাৎ ডাক্তার গম্ভীর হইয়া গেল। সে বলিল, "না মিস ভট্টাচার্য্য, আপনি অনর্থক কষ্ট করবেন না।"

"কেন, ডাক্তার মুখার্জ্জি, আপনি কি অন্য কোথায়ও কথা দিয়েছেন?"

এইবার মনসিজ হাসিল। সে বলিল, "না আমি কারও "বাগদত্ত" নই। আমি বিবাহ কর্‌তে আপাততঃ রাজি নই।"

"আর আমারও যদি সেই কারণ হয়?"

"তা হতে পারে, অবশ্য; তবে আপনার বিবাহে রাজি না থাকার কারণ কি, সেটা আমি মোটেই বুঝ্‌তে পারি নে।"

"আমিও ঠিক ঐ কথাই আপনাকে বল্‌তে যাচ্ছিলাম।"

"আমি পুরুষ মানুষ, আমাকে খেটে খেতে হবে। আমার নিজের পকেট দেখে, তবে একজনের ভার ঘাড়ে নিতে হবে। আপনার ত আর তা নয়।"

"ঠিক তা নয়, বটে; তবে আমি মেয়েমানুষ বলেই যে আমার বোঝাটা একজনের স্কন্ধে জোর করে' চাপাইতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। সেটা আমার বড়ই অশোভন বলে ঠেকে। আমার ইচ্ছে হলেই আমি কাউকে বিয়ে করতে পারি নে, কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলেই একজনকে বিয়ে করতে পারেন, এবং সেটা যদি শুধু পকেটের অবস্থা দেখে করতে হয়, ত দু দিন পরে করলেই চলতে পারে। দুদিন আগে পাছে, এই বই আর কিছু নয়।"

"আরও কিছু থাক্‌তেও পারে?"

"সে ত আগে বলেছি, যদি কাউকে কথা দিয়ে থাকেন।"

"না, কথা দিলেও যদি মনে মনে কাউকে বরণ করা যায় এবং তাকে বিবাহ করবার যদি কোনও বাধা থাকে—"

কল্যাণীর হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। মর্মাসিক্ত জিজ্ঞাসা করিল,

"আপনার ত সে রকম কোনও কারণ নাও থাক্‌তে পারে?"

কল্যাণী এ পর্য্যন্ত সপ্রতিভ ভাবেই তর্ক করিতেছিল; কিন্তু এইবার তাহার সে সপ্রতিভ ভাব কোথায় পলায়ন করিল। লজ্জার রক্তিমাভা তরঙ্গে তরঙ্গে তাহার মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত

হইতে লাগিল। মনসিজ কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহা দেখিল ; পরে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। কল্যাণী ভাবিল, "না জানি, কি বলিতে কি বলিয়াছি! ছি! ছি! কত কথা বলিব ভাবিয়াছিলাম, কিছুই বলা হইল না।"

মনসিজ প্রায়ই আসিত, রামকিঙ্কর ভাল থাকিলেও আসিত। কল্যাণীর সহিত গল্প করিয়া, তর্ক করিয়া সে তাহার কর্ম্মক্লান্ত জীবনের কিছু সময় কাটাইয়া দিতে ভালবাসিত। কল্যাণীও কলেজের ধরা বাঁধা নিয়মের গণ্ডীর বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া দিনান্তে একবার মুক্তির আস্বাদন পাইত। দুইটি বিহঙ্গ সারা দিনমান উড়িয়া উড়িয়া একবার যখন পরস্পরের সাক্ষাৎলাভ করে, তখন তাহারা আপনাদের অর্দ্ধব্যক্ত ভাষায় কি বলে, তাহা তাহারাই জানে! কিন্তু তাহাদের সেই ক্ষণিক হৃদয়-বিনিময়ের জন্য মনে হয়, যেন সারা বিশ্ব উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে। অনাদিকাল হইতে এই চিরপুরাতন অথচ চির নূতন সুর স্বর্গে মর্ত্ত্যে, আকাশে বাতাসে, নানা রাগ রাগিণীর মধ্য দিয়া, নানা ছন্দে, নানা প্রবন্ধে অনুরণিত হইয়া উঠিতেছে।

কল্যাণী ও মনসিজ উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের সন্ধান পাইয়াছে। উভয়ে বুঝিয়াছে যে এই পৃথিবীর মধ্যে তাহারাই দু'জন বিশিষ্ট প্রাণী—যাহাদের তুলনা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কল্যাণী ভাবিত, "মনসিজ কি সুন্দর! এমন সুন্দর কোথায়ও কি আছে? বিধাতার সৃষ্টির অপূর্ব্ব নিদর্শন এই চাঁদ না জানি কোন গগনে উঠিবে!" মনসিজ ভাবিত,

"কল্যাণী কি আমার হইবে? যদি হয়, তবেই এ জীবন সার্থক। যদি না হয়, তবে এই আহার বিহার নিদ্রার সমষ্টি বহন করিয়া লাভ কি?"

রামকিঙ্কর দেখিতেন, ইহারা একান্তই পরস্পরের পক্ষপাতী। শিক্ষিত মেয়েরা অবাধে সকলের সঙ্গে কথা কহে, অসংকোচে সকল স্থানে যাতয়াত করে, ইহাতে তাঁহার পূর্ব্ব-সংস্কারে কিঞ্চিৎ ধাক্কা লাগিলেও, একরূপ সহিয়া গিয়াছিল; কল্যাণীর সম্বন্ধে বৃদ্ধের একটু দুর্ব্বলতাও যে না ছিল এমন নহে। পিতৃমাতৃহীনা বালিকার জীবনকে সরস বা কোনও প্রকারে বরণীয় করিবার মত কোনই শক্তি তাঁহার ছিল না, ইহা তিনি বুঝিতেন। তাই বিদ্যাবাগীশের মত পুরাতন বন্ধুর এই বিদ্বান্ ও সচ্চরিত্র ছেলেটি তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারে যখন একখানি স্নেহের আসন পাতিয়া লইল, তখন তিনি শঙ্কিত না হইয়া আনন্দিতই হইলেন। বিশেষতঃ ডাক্তার বড়ই ভাল লোক, তাঁহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ডাক্তারের ন্যায় আর কেহই নাই। তাঁহাকে চিকিৎসা করিবার জন্য ডাক্তার যেমন প্রতিদিন আসিতেন, তেমনই প্রতিদিন আসেন, তেমনই প্রতিদিন গল্প করেন, হাসেন তাঁহাকে মিষ্ট কথায় তৃপ্ত করেন। প্রতিদিন তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধের মনে সেই আসাটাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। বরং ডাক্তার না আসিলে, তাঁহার মনে হইত যেন দৈনন্দিন ব্যাপারের মধ্যে কোথায় একটা মস্ত ফাঁক রহিয়া গেল।

৩

রামকিঙ্কর অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় একদিন প্রস্তাব করিলেন যে তিনি সস্ত্রীক গঙ্গাসাগর যাইবেন ; রামকিঙ্কর যদি যান, তবে তিন জনে দিন কতক অন্ততঃ হাওয়া খাইয়া আসা যাইতে পারে। বৃদ্ধ বহুদিন কল্যাণীকে ছাড়িয়া কোথায়ও যান নাই ; সুতরাং তিনি এই প্রস্তাবে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং তখনই কল্যাণীকে ডাকিয়া তাহার সম্মতি গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তারের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া রামকিঙ্কর গঙ্গাসাগর যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় এক কথা এক শতবার বলিয়া, কল্যাণীকে সাবধানে থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া গেলেন।

মনসিজ প্রতিদিন আসিত। সকালে আসিয়া সে বেশীক্ষণ বসিতে পারে না ; কল্যাণী তাহাকে দুপুর বেলায় আসিতে বলিত। কল্যাণী কলেজে যাওয়া বন্ধ করিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, বাড়ীতে পড়া শুনা ভাল হয় ; পরীক্ষা নিকটে আসিয়াছে কি না। কল্যাণী যে লেখাপড়ার জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিল না, তাহা সে নিজেই বুঝিত। মনসিজ যখন আসিত, তখন তাহার পড়াশুনা ত হইতই না ; যখন সে আসে নাই, তখনও তাহারই ধ্যানে, তাহারই আশায় কল্যাণীর সমস্ত মনপ্রাণ নিমগ্ন হইয়া থাকিত। মনসিজ রোগী দেখিয়া কল্যাণীদের বাড়ীতে আসিত এবং সমস্ত বিকাল বেলা সেখানেই কাটাইয়া দিত। রোগীরা তাহাকে বাড়ীতে না পাইলেই কল্যাণীর বাড়ীতে খোঁজ করিত।

একদিন কল্যাণী তাহার এক বন্ধুর বিবাহের নিমন্ত্রণে যাইবে বলিয়া কাপড় জামা গুছাইতেছিল। ঠাকুরদাদার দেরাজ খুলিয়া কতকগুলি কাপড় ও গহনা বাহির করিল। দেরাজের এক কোণে একটি কেস্ ছিল, পূর্ব্বে সেটিকে সে কখনও দেখে নাই। আজ প্রথম সে নিজ হাতে গহনা বাহির করিতে বসিয়াছে। কেস্‌টি টানিয়া বাহির করিয়া দেখিল, তাহার মখমল জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অনেক কষ্টে কেস্‌টি খুলিয়া দেখিল, একছড়া সুন্দর হার। তাহার মাঝখানে একখানি বড় হীরা বসানো লকেট্। কল্যাণী লকেট্‌টি খুলিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিছুতেই পারিল না। এমন সময় মনসিজ আসিল; হার দেখিয়া সেও অনেক সুখ্যাতি করিল। পকেট হইতে একখানি ছুরি বাহির করিয়া সে লকেট্‌টি খুলিয়া ফেলিল; দেখিল একটি ক্ষুদ্র শিশুর ছবি। মনসিজের পাশে দাঁড়াইয়া কল্যাণী সেই ছবি দেখিয়া হাসিতে লাগিল। মেয়েটির গোলগাল মুখখানি ভরা হাসি, কপালে একটি খয়েরের টিপ আর হাতে একটি ফুল— বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল।

কল্যাণী বলিল, "বলুন ত কার ছবি?"

"কার?"

"আমার, আর কার? চিন্‌তে পার্‌লেন না?"

মনসিজ একটু গম্ভীর হইয়া কি যেন স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কল্যাণী একটু মুখ ভার করিয়া "আপনার পছন্দ হল না

বুঝতে পেরেছি।" বলিয়া হার লইয়া গলায় পরিল। মনসিজ তখনই সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "না না, আমি ভাবছিলাম যদি এ আপনার ছবি হয়, তা হলে ত আপনার এ হার পরা ঠিক হবে না।"

কল্যাণী হাসিতে হাসিতে হার খুলিল; মনসিজ সে হার লইয়া নিজের গলায় পরিল। লজ্জায় কল্যাণী চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া দেরাজে আবার সব গহনা তুলিয়া রাখিতে প্রবৃত্ত হইল। নেকলেশ খুলিবার সময় একটুকরা কাগজ পড়িয়া গিয়াছিল, লকেটের ভিতর কি আছে তাহা দেখিবার আগ্রহে কল্যাণী সে কাগজখানির কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। এইবার সেখানিকে তুলিয়া সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া ফেলিল, দেখিল একখানি চিঠি। নীচে স্বাক্ষর "তোমার কলঙ্কিনী মা" উপরে "আমার খুকা" এই পাঠ।

কল্যাণীর গণ্ডদেশ রক্তশূন্য হইয়া গেল, তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। মনসিজ তাহার এই ভাবান্তর দেখিয়া ভীত হইল। কল্যাণী কোনও রূপে পড়িল,—

"আমার খুকা,

আমি চলিলাম। বড় হইয়া তুমি আমার কলঙ্কের কথা শুনিবে। তুমি আমার কলঙ্কের সহিত জড়িত নও। তোমাকে ছয় মাসের লইয়া বিধবা হইয়াছিলাম। তার পরই কপাল পুড়িল। দিবানিশি সেই আগুনে পুড়িতেছি। আমি তোমার

মা, এই বলিয়া যদি ক্ষমা করিতে পার, করিও। আর কিছুই বলিবার নাই। আশীর্ব্বাদ করি, কল্যাণি, তোমার যেন সুমতি হয়। ইতি

তোমার কলঙ্কিনী মা।”

কল্যাণীর মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। মনসিজ তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে “মাগো” বলিয়া কল্যাণী আবার মূর্চ্ছিত হইল। মনসিজ চিঠিখানি একবার দেখিয়া লইল। তারপর কল্যাণীর চৈতন্য সম্পাদন করিয়া তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার মনও ভাল ছিল না।

পরদিনও সে আসিল; দেখিল কাঁদিয়া কাঁদিয়া কল্যাণীর চক্ষু ফুলিয়া গিয়াছে। মনসিজ একটু সান্ত্বনার কথা বলিতেই দরদরধারে তাহার চোখের জল ছুটিল। মনসিজের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। একটু লক্ষ্য করিলেই কল্যাণী বুঝিতে পারিত, চিন্তায় ও দুঃখে মনসিজের মন একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরগত হইয়াছে। কল্যাণী বুঝিয়াছিল তাহার পক্ষে মনসিজকে পাইবার আশা চিরকালের জন্য ব্যর্থ হইয়া গেল। ইহাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ।

মনসিজ আজ কল্যাণীর হাতখানি ধরিয়া ফেলিল। আগে কখনও সে কল্যাণীকে স্পর্শ করে নাই। স্পর্শ কি এমন করিয়া চেতনা হরণ করে? কল্যাণীর সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; মুখে লালিমার রক্তপদ্ম-কোরক ফুটিয়া উঠিল। মনসিজ

বুঝিল; সে ধীরে ধীরে তাহাকে শয্যার প্রান্তে বসাইয়া, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল, একটিও কথা কহিল না। ভাষায় যাহা ব্যক্ত করিতে পারে না, আজ এই মুহূর্ত্ত মাত্রের স্পর্শে তাহা যেন অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনার সহিত উভয়ের হৃদয়ে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সেই একটিবারের স্পর্শ যেন শতবার কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "ওগো তোমায় কত ভালবাসি; ওগো তোমায় কত ভালবাসি; আমার জীবন এমন করিয়া ব্যর্থ করিয়া দিও না।"

অনেকক্ষণ কেহই কথা কহিল না। কল্যাণীর সমস্ত হৃদয় যেন উদ্বেলিত, মথিত, নিপীড়িত করিয়া অশ্রুধারা বহিল। মনসিজ বলিল, "অদৃষ্টের উপর কাহারও হাত আছে কি, কল্যাণী?"

আজ সে সর্ব্বপ্রথম "কল্যাণী" বলিয়া ডাকিল। কি মিষ্ট সে ডাক!

কল্যাণী উত্তর করিল না, কেবল কাঁদিতে লাগিল। মনসিজ আবার কথা কহিল,

"কেঁদে কেঁদে জ্বর করেছ, তা কি বুঝতে পাচ্ছ?" মনসিজ এই প্রথম "আপনি" ছাড়িয়া "তুমি" বলিল, দুঃখ-শোকের মধ্যে হৃদয়ে হৃদয়ে যে মিলন ঘটে, তাহা কৃত্রিমতার ধার ধারে না।

প্রেমের এই পরিব্যক্ত নিদর্শনে কল্যাণীর অন্তরাত্মা যেন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে কেবল বলিল, "আমার মরাই ভাল।"

মনসিজ অতি কাতরভাবে তাহার দিকে চাহিল। কল্যাণী দেখিল, একবিন্দু অশ্রু মনসিজের চোখে টলমল করিতেছে।

মনসিজ কহিল, "কল্যাণী তুমি যদি আমায় ভালবাসতে, তা হ'লে কি এমন কথা আমাকে বল্‌তে পার্‌তে? তুমি জান না যে আমার প্রাণে কি আঘাত দিচ্ছ।"

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কল্যাণী একটু মর্ম্মান্তিক হাসি হাসিয়া বলিল, "যদি ভালবাসতে, যদি ভালবাসতে"—

সে যেন আপনা আপনি কথা কয়টী বলিতেছিল।

মনসিজ আবেগভরে তাহার মস্তক বক্ষে টানিয়া লইল; 'তুমি আমায় ভালবাস, তুমি আমায় ভালবাস, কল্যাণী?"

কল্যাণী আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল,—"ভালবাসি, ভালবাসতাম; বিধাতা সাক্ষী, এমন করে বুঝি কেউ কাউকে ভালবাসেনি, এত ভালবাসতাম। যত ভালবাসা আমার ক্ষুদ্র প্রাণে ধরে, তত ভালবাসা দিয়ে বাসতাম; কিন্তু এই তার শেষ।"

"কেন কল্যাণী?"—একান্ত আগ্রহভরে মনসিজ কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ধীরে ধীরে কল্যাণী বলিল, "অপবিত্র ফুলে দেবতার পূজা হয় না।"

"তোমার ত কোন দোষ নেই।"

"তবুও আমি অস্পৃশ্যা। এ কলঙ্কের বোঝা তোমার স্কন্ধে কখনও—"

সে আর বলিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মনসিজ অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। কিন্তু কল্যাণী আর আসিল না।

(৫)

কল্যাণী শান্ত হইয়াছে। সে তাহার চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়াছে, দৃঢ় সংকল্পের রেখা তাহার ললাটে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মনসিজ প্রত্যহ নিয়মমত আসিত। কিন্তু কল্যাণী অতি সঙ্কোচের সহিত তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহে, বেশী কাছে আসে না, গল্প করে না, সকল কথার জবাব দেয় না। মনসিজ এই সংকল্পের প্রাচীর ভেদ করিবার কোনও পথ না দেখিয়া কিছুক্ষণ পরেই চলিয়া যায়। সে বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে।

গঙ্গাসাগরের যাত্রীরা ফিরিলেন। রামকিঙ্কর পীড়িত হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সংজ্ঞা বড় একটা ছিল না। কোনও প্রকারে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে আনা হইল এবং কল্যাণী তাঁহার শুশ্রূষায় একান্ত মনে আপনাকে নিয়োজিত করিল; এক মুহূর্ত্তও তাঁহার শয্যাপার্শ্ব ছাড়িয়া যায় না। মনসিজও প্রতিদিন দুই তিনবার করিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু বৃদ্ধের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, কল্যাণী তাহা বুঝিতে পারিল না; সে কখনও মৃত্যুর এত নিকটের মূর্ত্তি দেখে নাই। মনসিজ বুঝিল ও কল্যাণীর জন্য ভাবিত হইল।

একদিন একটু ভালই দেখা গেল। কল্যাণী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত

হইল। মনসিজ আসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিল, "আজ ত ভালই আছেন কর্ত্তা?"

রামকিঙ্কর একটু হাসিলেন। বলিলেন—"ফিরব বলে বোধ হয়?"

মনসিজ বলিল—"এ যাত্রা বেচে গেলেন। কোনও ভয় নেই।"

বৃদ্ধ শীর্ণ কঙ্কালাবশেষ হাত দুইখানির মধ্যে মনসিজের হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"তুমি বল, ভয় নেই,—কল্যাণীর জন্যে ভয় নেই, তা হলেই সুখে মরতে পারব?"

ডাক্তারের মুখ লাল হইয়া উঠিল। কল্যাণী মুখ ফিরাইয়া লইল।

ডাক্তার বলিলেন—"আপনার কোনও ভয় নেই।"

রামকিঙ্কর তাঁহার মস্তকে হস্ত রক্ষা করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিলেন ও বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও।"

কিছুক্ষণ পরে কল্যাণীকে বলিলেন,—"আমার একটা কাজ বাকী রয়ে গেল। যাওত দিদি, আমার দেরাজের মধ্যে একটা মখ্‌মলের কেস্ আছে নিয়ে এস ত। চাবি তোমারই কাছে না?"

কল্যাণী উঠিয়া গেল। মনসিজ ভাবিল, মৃত্যুর পূর্ব্বে কল্যাণীর পূর্ব্বকাহিনী বলিয়া যাইবেন; এস্থলে অপরের না থাকাই ভাল। সে হঠাৎ উঠিয়া, একটী নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। কিন্তু রামকিঙ্কর তাহাকে ইঙ্গিত

করিয়া বসিতে বলিলেন। কল্যাণী কেস্‌টী হাতে করিয়া, যেন তাহার মৃত্যুদণ্ড শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিল।

রামকিঙ্কর হারছড়া লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহার শুষ্ক নিষ্প্রভ চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া আসিল। তার পরে লকেটটি লইয়া খুলিতে চেষ্টা করিলেন। ডাক্তার বলিলেন "আমায় দিন, আমি খুলে দিচ্ছি।" ডাক্তার সেটী খুলিয়া বৃদ্ধের হস্তে দিল।

বৃদ্ধ সেই শিশুর ছবির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তারপরে বলিলেন—"এই হতভাগিনীর মা আমারই মেয়ে ছিল।" বৃদ্ধের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। কল্যাণী ও মনসিজ চমকিয়া উঠিল।

মনসিজ লকেটটী সজোরে কাড়িয়া লইয়া বলিল—"এ কল্যাণীর ছবি নয় তবে?" তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে একবার ছবির দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিয়াছিল, বৃদ্ধ তাহা দেখিতে পাইলেন না।

কল্যাণী ঠাকুরদাদার পা দুখানি বক্ষে তুলিয়া লইল। বৃদ্ধ কম্পিত হস্ত বাড়াইয়া হারটি পুনরায় লইলেন ও ছবির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমার কুলে যে কালি দিয়েছে, মরণের সময়েও তাকে আশীর্ব্বাদ করতে ইচ্ছে হয় না। তবে এ মেয়েটার কোনও দোষ নেই। সে যদি আজও বেঁচে থাকে ত কল্যাণীর চেয়ে বড় হয়েছে। তার মা যখন আমার বাড়ী ছেড়ে চলে গেল, খুকী তখন দশ মাসের। তার দু মাস আগে সে বিধবা হয়েছিল।

যাক্, খুকীর মা আমার বাড়ী থেকে যখন চলে গেল, তখন তার শ্বশুর বাড়ীতে খবর দিলাম, যে আমার মেয়ে কলেরা হয়ে মারা গেছে। শ্বাশুড়ী মাগী খবর পেয়েই কচি মেয়েটাকে নিয়ে গেল; ডুদিনও আমার কাছে থাকতে দিলে না। সেই অবধি একদিনও তাদের নাম করিনি, তারাও পরে সব শুনতে পেয়ে এদিক আর মাড়ায় নি। এই হার ছড়া আমি তাকে দিতে পারি নি। এর সঙ্গে একটা চিঠি ছিল, দেখত দিদি, কোথায় গেল সেটা।"

কল্যাণী চিঠিখানি তাঁহার হস্তে দিল। তিনি ঘৃণায় তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ডাক্তার চিঠিখানি কুড়াইয়া লইয়া পড়িল। বলিলেন—"এ চিঠিতে কল্যাণীর নাম রয়েছে না?"

"কল্যাণী তখন কোথায়? কল্যাণীর নাম কোথায়?"

ডাক্তারের চিন্তামলিন বদন মণ্ডলে সহসা হাস্যের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। "ওঃ 'আশীর্ব্বাদ করি কল্যাণী'—ওটা নাম নয়!"

গ্রীষ্মের প্রভাতের গুমোট কাটিয়া গেলে যেমন সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণের বন্যায় জগৎ আপ্লুত হইয়া উঠে, তেমনি কলঙ্ক-সন্দেহের মেঘ কাটিয়া গিয়া সে ঘরের মধ্যে যেন আনন্দময় আলোকের তুফান খেলিয়া গেল। বৃদ্ধ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

"পার যদি সন্ধান করতে, তবে হার ছড়াটা পৌঁছে দিও।"

মনসিজ হঠাৎ চলিয়া গেল।

বিকালে আবার রামকিঙ্করের অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল।

মনসিজকে ডাকিয়াও পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে মনসিজ ব্যস্ত সমস্ত ভাবে রোগীর গৃহে প্রবেশ করিল। কল্যাণী নীরবে কাঁদিতেছিল। ডাক্তার অনেকবার ডাকিয়া ডাকিয়াও বৃদ্ধের সাড়া পাইল না। শেষে একবার চীৎকার করিয়া বলিল; "কর্ত্তা আপনার সেই খুকীকে দেখবেন?"

কল্যাণী চমকিয়া উঠিল। বৃদ্ধের অক্ষিপুট উন্মীলিত হইল। সম্মতি বুঝিয়া ডাক্তার নীচে নামিয়া গেল ও শীঘ্রই একটি তরুণীকে ও তাহার শিশুপুত্রকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তরুণী আসিয়া বৃদ্ধের পদধূলি লইল; ডাক্তার কল্যাণীকে বলিল,—"ইনি আমার একজন রোগী। এঁর স্বামী আমার সুপরিচিত। তাঁর কাছেই পরিচয় পেলাম। লকেটটি প্রথম দিন দেখেই আমার মনে হয়েছিল যে আমি কোথায়ও যেন সে চেহারা দেখেছি। তবে অত ছোট বেলার চেহারা দেখে লোক ঠিক ধরা যায় না। তার পর তোমার নামেই কম ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিল!"

বৃদ্ধ অনেক ডাকাডাকির পর একবার চাহিয়া দেখিয়াই তরুণীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত আশীর্ব্বাদে পবিত্র হইয়া গেল।

যমুনা

(১)

যমুনার বিবাহ লইয়া শরৎকুমার বড়ই গোলে পড়িলেন।

শরতের পিতা মৃত্যুকালে শরৎ ও যমুনাকে তাঁহার মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে ডাকিয়া সকলের সমক্ষে তাঁহার শেষ কথা বলিয়া গিয়াছিলেন,—"আমার যমুনাকে সুপাত্রে দিও।" সেই কথার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবনবায়ু অনন্ত শূন্যে মিশিয়া গিয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এখনও শরতের কাণে, পিতার দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত নির্গত, সেই শেষ কথা কয়টি মাঝে মাঝে বাজিয়া থাকে। কিন্তু যমুনার বিবাহের জন্য তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। যমুনাকে কেহ বিবাহ করিতে রাজি হয় নাই,—সে যে কুড়ানো মেয়ে!

দামোদরের বন্যায় ভাসিয়া ভাসিয়া একটি বালিকা নন্দনপুরের জমিদার গোপালবাবুর অলিন্দের নিম্নে আসিয়া পড়িয়াছিল, গোপালবাবু প্রভাতে দেখিলেন, একখানি চালের উপর ছোট একটি মেয়ে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহারই দরজায় ঠেকিয়াছে। চারিদিকে রাঙা জল ঢেউ তুলিয়া খেলা করিতেছে, আর তারই মাঝখানে একটি পদ্মকোরকের মত ভাসিতেছিল—এই মেয়েটি। জলের স্রোত যেন তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার জন্য ফুলিয়া

ঝুলিয়া ঘুরিতেছিল। গোপালবাবু বসনের পাশ হইতে মুক্ত করিয়া মেয়েটিকে তুলিয়া লইলেন এবং অনেক পরিচর্য্যার পর তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। যেদিন প্রথম সে চক্ষু মেলিল, সেদিন গোপালবাবুর আনন্দ আর ধরে না। মানুষের প্রাণদান করেন বিধাতা; কিন্তু যদি কখনও কাহারও চেষ্টায় বিধাতার কৃপা হয় ও মুমূর্ষু প্রাণ পায়, তবে তাহার যে আনন্দ, যে অপরিসীম পুলক তাহা সে-ই জানে, অন্য কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। চিত্রকরের স্বকরাঙ্কিত চিত্রের প্রতি যে মমতা, সন্তানের প্রতি পিতার যে মমতা, আর্ত্তের প্রতি প্রাণদাতার মমতা তাহা অপেক্ষা বড় কম নহে। গোপালবাবু দুই হস্তে মেয়েটিকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার আশ্রিত ও পরিবারবর্গ যদি সে সময়ে চোখের প্রান্তে একটু দৃষ্টি বাঁকাইয়া থাকে, তবে তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর তাঁহার ছিল না।

গোপালবাবুর স্ত্রী দুইটি শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোকগমন করিলে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করাই তাঁহার সংসারের একমাত্র কর্ম্ম ছিল বলিলেও হয়। শিশু দেখিলেই বিশেষতঃ মাতৃহারা শিশু দেখিলেই তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। বন্যাবাহিত এই অনাথা বালিকাকে নিজের দুয়ারে কুড়াইয়া পাইয়া, তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহপরতা শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মেয়েটি যে ক'দিন জ্বরঘোরে অচেতন ছিল, সে ক'দিন তাহার শয্যাপার্শ্ব হইতে কেহ তাঁহাকে উঠাইতে পারে নাই, মেয়েটি চক্ষু মেলিয়া ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাঁহারই মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

কিছুদিন ধরিয়া সে স্তব্ধ হইয়াই ছিল। তাহার বয়স যদিও তখন ছয় কি সাত বৎসর অনুমিত হইতে পারিত, তথাপি সে একটি কথাও বলিতে পারে নাই। তাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে অবাক হইয়া থাকিত—যেন কিছু মনে পড়ে, অথচ কিছুই সে ব্যক্ত করিতে পারে না। তাহার ক্ষুদ্র জীবনের উপর দিয়া হঠাৎ যে প্রবল ঝড়টি বহিয়া গেল, তাহার ফলে শুধু যে তাহার ক্ষীণ কোমল শরীরকে পাড়িয়া ফেলিয়াছিল, তাহা নহে, তাহার মনের উদ্যানে যে চারা গাছগুলি সদ্যঃ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল, সেগুলিকেও একেবারে ছিঁড়িয়া, বিধ্বস্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল।

অসুখ সারিবার পর তিন চার মাস লাগিয়াছিল, শুধু তাহার কথা কহিতে শিখিতে। সুতরাং সে সর্ব্বপ্রকারে রায় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতে পারিল; গত জীবনের একটুও স্মৃতি তাহার আর রহিল না। বন্যায় ভাসিয়া আসিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইল—যমুনা।

সমৃদ্ধিশালী রায় পরিবারের সন্তানগণ যে সমস্ত সুবিধা ও সুযোগ পায়, তাহা হইতে যমুনা বঞ্চিত হইল না। উপরন্তু গোপালবাবু নিজে তাহার শিক্ষা-দীক্ষার ভার লইয়াছিলেন। তাহাতে তাহার বয়োবৃদ্ধিজনিত লাবণ্যের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা মানসিক পরিণতি হইয়াছিল, যাহা সচরাচর পাড়াগাঁয়ের মেয়ের ভাগ্যে ঘটে না। সে বাঙ্গালা বেশ শিখিয়াছিল, সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারিত, ইংরেজিও একটু আধটু

শিক্ষা করিয়াছিল। শরৎ কলিকাতায় পড়িত; কলেজের অবকাশ সময়ে যখন সে বাড়ী আসিত, তখন গোপালবাবু তাহাকে যমুনার পরীক্ষা লইতে বলিতেন। শরৎ তাহার প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইত। "মেঘনাদবধ"খানি সে আগাগোড়া মুখস্থ বলিতে পারিত এবং শুভঙ্করীর ফাঁকিগুলি সময়ে অসময়ে আর্টস্ কোর্সের ছাত্র শরতের নিকট উপস্থাপিত করিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিত।

গোপালবাবু যমুনার বিবাহের শুধু একটি শুভসংকল্প মাত্র রাখিয়া চলিয়া যান নাই। তিনি তাঁহার উইলে যমুনাকে কিছু সম্পত্তি দিয়া ও তাহার বিবাহের জন্য নগদ দুই হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। শরৎ সে দুই হাজারের স্থলে চার হাজার পণ দিতে স্বীকার করিয়াও তাহাদের সমশ্রেণীর মধ্যে সুপাত্র মিলাইতে পারিলেন না। ঘটকের পর ঘটক আসিতে লাগিল— যমুনার বিবাহের জন্য নহে; শরতের বিবাহেই তাহাদের যত্ন। কিন্তু শরতের ধনুর্ভঙ্গ পণ, যমুনার বিবাহ না দিয়া নিজে বিবাহ করিবেন না। শরতের জননী জীবিতা থাকিলে এ পণ হয়ত তাঁহাকে ভাঙ্গিতে হইত। বিধবা ভগ্নী বিমলার অশ্রু শরতের প্রতিজ্ঞা টলাইতে পারিল না।

বিমলা তাহার রাগের ঝাল ঝাড়িত যমুনার উপর। পিতার শেষ অনুরোধ পালন করিতে শরৎকুমার যে পরিমাণ শ্রম ও অর্থব্যয় করিলেন, তাহাতে সকলেই ধন্য-ধন্য করিল। কিন্তু যমুনার বর জুটিবার আশা একটুও নিকটবর্ত্তিনী হইল না।

অজ্ঞাতকুলশীলার পাণিগ্রহণে মনোমত অর্থাৎ লেখাপড়া জানা সদ্বংশজাত পাত্র একটিও মিলিল না।

(২)

বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যে কূল পাইয়াছিল, ঘটনার স্রোত তাহাকে আবার ভাসাইয়া লইয়া চলিল। এবারেও বিধাতা তাহাকে কূল দিবেন কি? যমুনা সেই কথাই ভাবিত।

সংসারের তিক্ত স্বাদ সে কিছু কিছু অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিন আদরে যত্নে যে সকলের ঈর্ষার পাত্রী হইতে পারিয়াছিল, তাহার অদৃষ্টে যদি শেষে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ভোগ করিতে হয়, তবে সে যন্ত্রণা সহিবার ক্ষমতা বুঝি সর্ব্বংসহা বসুমতীরও থাকে না। বিমলা প্রথম হইতেই যমুনার প্রতি হিংসায় জ্বলিয়া মরিত। তারপর যখন বিমলার কপাল ভাঙ্গিল ও পিত্রালয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বসবাস করিবার পাট্টা তাহাকে দেওয়া হইল, তখন সে যমুনাকে বিষ নয়নে দেখিতে লাগিল। শরতের ভয়ে প্রথম প্রথম সে বড় একটা কিছু বলিতে সাহস করিত না। কিন্তু যখন দেখিল যে, শরৎ সাতের মধ্যেও নাই, পাঁচের মধ্যেও নাই, তখন সে একটু একটু করিয়া রসায়ন চড়াইতে লাগিল। কুটুম্বিনীগণ বিমলার নিকট অনেক প্রত্যাশা করিত, বিশেষতঃ বিমলা সংসারের কর্ত্রী; যমুনা ত দু'দিন পরে পরের ঘরে চলিয়া যাইবে, প্রতিবেশিনীগণ যমুনার ব্যবহারে বিশেষ কিছু ত্রুটী না পাইলেও, তাহার অসম্ভাবিত শুভাদৃষ্টের

জন্য অসুখী। সে ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহার জন্য আবার এত কেন? একচোখো বিধাতা এমনি করিয়াই কি অপাত্রে সৌভাগ্য দান করেন?

প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্ণে রায়বাড়ীর অন্দরে মেয়েদের বৈঠক বসিত। পরচর্চ্চায় সে মজলিস্ জমিত। বিমলা, বেচারী যমুনাকে লইয়া এই সব বৈঠকে বেশ রঙ্গরস জুড়িয়া দিত। শরতের এতদিন বিবাহ হইলে ছেলেপুলে হইত, সোণার সংসারে চাঁদের হাট বসিত। কাহার জন্য তাহা হয় নাই? পোড়ার-মুখী এমন করিয়া আর কতদিন জ্বালাইবে? বেদের মেয়ে কি জোলার মেয়ে—হিন্দু কি মুসলমান—কিছুই ঠিক নাই; কে ঐ অভাগীকে বিবাহ করিবে। শরতের যত না তা-ই!—এইরূপ মন্তব্য করিয়া, পাড়ার শ্যামাঠাকরুণ, পদী পিসী ও নেত্য ঠান্‌দি প্রতিদিন সন্ধ্যায় সুপারি, কদলী বা কুমড়া সংগ্রহ করিয়া রায়বাড়ী হইতে বিদায় লইতেন। বিমলা আঁখির কোনে বিদ্রূপের হাসি ফুটাইয়া, যমুনা "বিবির" বিবাহে কিরূপ হুলু দিতে হইবে তাহার অভিনয় করিত।

একদিন ব্যাপার কিছু বেশীদূর গড়াইল। বিকাল বেলা বিমলার বৈঠক বসিয়াছে। প্রতিবেশিনী ও কুটুম্বকন্যাগণ বিমলার কথায় কখনও সায় দিয়া যাইতেছে, কখনও তাহার উপর রঙ চড়াইয়া রগড় করিতেছে—আলোচ্য বিষয় ছিল যমুনার বিবাহ। সে সম্বন্ধে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অনেক কথাই বিমলা সে মজলিসে ব্যক্ত করিল, বিদ্রূপের রসায়ন দিয়া তাহাকে জারিল

এবং হিংসার জ্বালায় তাহা ছুরির মত তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিল। যমুনাকে তাহা নির্ম্মমভাবে বিদ্ধ করিলেও, পরচর্চ্চার যেমন দস্তুর—অপরের পক্ষে তাহা অতি উপভোগ্য হইয়া উঠিল। তাহারা হাসিয়া পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। যমুনা অনেকবার সেখান হইতে উঠিয়া আসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যূপকাষ্ঠে পশু বন্ধন করিয়া না রাখিলে উৎসর্গ করিতে বাধা হয় যে—সুতরাং তাহারা তাহার পথরোধ করিতে ভুলে নাই। কিন্তু যখন একান্ত তাহার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল, তখন সে উঠিয়া আসিয়া নিজের শয়নগৃহে সজোরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

প্রধূমিত কাষ্ঠে যেমন কেরোসিন ঢালিয়া দিলে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, বিমলার হিংসা-জর্জ্জরিত মন তেমনি রাগে জ্বলিয়া উঠিল। সে সকলের সমক্ষে এত অপমান সহিবে কিসের জন্য? সেই ত সংসারের মালিক, যমুনা ত ভাসিয়া আসিয়াছে! সে এ বাড়ীর কে? প্রতিবেশিনীগণ একবাক্যে এ কথার সমর্থন করিল। বলিল, "তাই ত বাছা, এত দেমাক কিসের গা? পাতের ভাত খেয়ে যে বাঁচবে, তাকে এমন করে বাড়িয়ে তুল্লে পরিণাম এমনই হয়। কুকুরকে নাই দিলে সে মাথায় উঠে বসে, বাপু। সহ্য না করে উপায় নেই।"

বিমলা সহ্য করিবে? কখনই না। সে রাগে অধীর হইয়া উঠিল। কুটুম্বিনীরা সে অনলে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। বিমলা সপ্তমে সুর তুলিয়া যমুনাকে গালি দিতে লাগিল এবং

যমুনা কোনই উত্তর করিল না দেখিয়া তাহার গৃহদ্বারে সজোরে পদাঘাত করিতে লাগিল। যমুনা ভয়ে ভয়ে দরজা খুলিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। বিমলা তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, সে গৃহ তাহার বাবার নয়। এত বড় স্পর্দ্ধা যে এতগুলি লোকের সাক্ষাতে, তাহারই খাইয়া তাহারই বাড়ীতে তাহারই ঘরে, তাহারই মুখের উপর ঘুঁটেকুড়ানীর মেয়ে দরজা বন্ধ করে!

যমুনা বুঝিতে পারিল না যে তাহার অপরাধ কোনখানে। সে উঠানে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল, অভিমানে তাহার ওষ্ঠদ্বয় স্ফুরিত হইতেছিল। বিমলা ভাবিল সে তাহাকে গালি দিতেছে। তখন সে যমুনার ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত জিনিষপত্র ছুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে লাগিল। সে সব কতক দেওয়ালের গায়ে লাগিয়া চুরমার হইয়া গেল, কতক যমুনার গায়ে লাগিয়া স্থানে স্থানে কাটিয়া গেল।

এইবারে সকলে বুঝিতে পারিল যে ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। তখন সকলেই বিমলাকে নিবৃত্ত হইতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। হাজার হউক ছেলেমানুষ, অবুঝ, তাদেরই আশ্রিত ইত্যাদি হেতুবাদে যখন তাহারা বিমলাকে ক্ষান্ত হইতে বলিল, তখন বিমলা মনে করিল যে, তাহারা যমুনার পক্ষ গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং সে এইবারে তাহাদিগকেও দুকথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িল না। যে ব্যক্তি গৃহে আগুন দেয়, অনেক সময় সে আগুনের লোল শিখা তাহাকেই আক্রমণ করে। এ

ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। গতিক বুঝিয়া কুটুম্বকন্যা ও প্রতিবেশিনীর দল ধীরে ধীরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল।

(৩)

সন্ধ্যার পর শরৎকুমার যখন অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন, তখন সব নিস্তব্ধ। বিমলার দ্বার অর্গলবদ্ধ, অনেক ডাকিয়াও তাহার সাড়া পাইলেন না। নিস্তার পিসীমা অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিলেন। শরৎ জিজ্ঞাসিলেন,

"কি হয়েছে, নিস্তার পিসীমা? কারও কোনও সাড়াই যে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"কি জানি, বাবা। বড় ঘরের কাণ্ড, আমরা গরীব অত শত বুঝি না।"—বলিয়া নিস্তার পিসীমা বিমলার ঘরের দিকে চাহিলেন, এবং চোখ টিপিয়া, ঢোক গিলিয়া কোনও মতে বিমলার ব্যাপার বিবৃত করিলেন। বিমলের যে বড় বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে, সে কথা তিনি গোপন করিতে পারিলেন না।

শরৎকুমার ধীরে ধীরে যমুনার কক্ষের দিকে আসিলেন। দরজা খোলা রহিয়াছে, কিন্তু আজ সে গৃহে আলো জ্বলে নাই। একটু মনোযোগ করিয়াই শরৎ বুঝিতে পারিলেন যে মেঝের উপর পড়িয়া যমুনা কাঁদিতেছে। তিনি নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন—"যমুনা!" যমুনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

শরৎ বলিলেন—"যমুনা, ঘর যে অন্ধকার, প্রদীপ জ্বালবে না?"

দুঃখের আবেগ হৃদয়ে চাপিয়া সে প্রদীপ জ্বালিল। শরৎ দেখিলেন যমুনা স্থির, প্রশান্ত, গম্ভীর। তাহার চক্ষুদুটি জলসিক্ত পদ্মপত্রের মত টলটল করিতেছে।

শরৎকুমার শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, যমুনা দাঁড়াইয়া রহিল। প্রদীপের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া শরৎ বলিলেন—"যমুনা, আজ ক'দিন ধরে একটি কথা তোমাকে বলব মনে করছি।"

যমুনার বুকের ভিতর হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। শরৎ একটু থামিয়া বলিলেন—"পিতার অন্তিম আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় আমি পূরণ করতে পারলাম না। আমার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়েছে। ঈশ্বর জানেন, আমি অর্থের দিকে চাইনি বা চেষ্টার ত্রুটি করিনি।"

বলিতে বলিতে শরতের কণ্ঠস্বর বাষ্পভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয় বড় কোমল ছিল। সঙ্গতিপন্ন পিতার একমাত্র মাতৃহীন পুত্র, জীবনে কখনও বাধা পান নাই। দুঃখ ক্লেশের আস্বাদন লাভ করিবার দুরদৃষ্ট যাহাদের হয় নাই, তাহারা সহসা দুঃখের মূর্ত্তি দেখিলে সহজেই বিচলিত হইয়া উঠে। সংসারের ধার শরৎকুমার বড় একটা ধারিতেন না। বন্দনার প্রতি অন্দরের এবং পুরাতন কর্ম্মচারীর উপর বিষয় কর্ম্মের ভার দিয়া তিনি একরূপ নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি যখন যাহা করিব বলিয়া মনে করিতেন, সহস্র বাধাও সে পথ হইতে তাঁহাকে টলাইতে পারিত না। যমুনার বিবাহের জন্য ব্যর্থ প্রয়াস তাঁহার মনে পীড়া

দিতেছিল। প্রতিদিন ঘটক আসিয়া তাঁহার সেই ব্যর্থতার ক্ষত মুখ নূতন করিয়া খুলিয়া দিয়া যাইত। তাই আজ সমবেদনা প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি সেই কথাই পাড়িলেন—অন্য কোনও কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। যাহা যমুনার মনে প্রতিনিয়ত ব্যথা দিতেছিল, তাহারই উত্থাপন করিয়া তিনি যে আনন্দের উপর আঘাত দিলেন, একথা আদৌ তাঁহার মনে আসিল না।

যমুনা প্রদীপ জ্বালিবার পূর্ব্বেই অশ্রু মুছিয়াছিল। তাহার পরিপূর্ণ গণ্ডস্থল বেদনায় লাল হইয়াছিল; বিবাহের প্রসঙ্গ শুনিয়া তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরও লাল হইয়া উঠিতেছিল। সে দুঃখের গুরুভারে অভিমানের রুদ্ধোচ্ছ্বাসে বায়ুবিতাড়িত বেতসীর মত থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

শরৎকুমার হঠাৎ দেখিলেন, তাহার বাহুতে রক্তচিহ্ন। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া তাহার হস্তখানি টানিয়া লইয়া ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিলেন। তখনও একটু রক্ত বহিতেছিল। যমুনা বসনাঞ্চলে ক্ষত চাপিয়া লুকাইবার বৃথা চেষ্টা করিল।

"কি হয়েছে যমুনা ?"

"কেটে গিয়েছে।"

"কেমন করে কাট্‌লো ?"

যমুনা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া শরৎ কারণ কতকটা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে পড়িল, কি আদরেই

যমুনা লালিত হইয়াছিল। পিতার স্নেহে যে যমুনা কখনও দুঃখের মুখ দেখে নাই, আজ তার এই দশা!

যমুনার মন শরৎকুমারের আদরে গলিয়া গেল। গোপাল বাবুর মৃত্যুর পর, এতখানি স্নেহ সে আর কখনও পায় নাই। তাহার অশ্রু এবারে আর বাঁধ মানিল না, শতধারে প্রবাহিত হইয়া তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া দিল। শরৎকুমার আরও নিকটে গিয়া তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। যমুনার মস্তক শরতের বক্ষে ঢলিয়া পড়িল। সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শরৎকুমার যমুনার হস্ত আপনার হস্তপুটে লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অতি কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যমুনা, আমি তোমাকে বিবাহ করলে তুমি সুখী হবে?"

যমুনা চমকিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ সম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল: তাহার চোখের জল চোখেই শুকাইয়া গেল। প্রদীপের আলো যেন সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না, তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। শরৎকুমার ব্যগ্রভাবে আবার বলিলেন—"বল, তুমি সুখী হবে?"

শরৎকুমার যে বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া এই প্রস্তাব করিয়া বসিলেন, তাহা বলা যায় না। ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করা তাঁহার কখনও অভ্যাস ছিল না। যমুনার দুঃখে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল, তাই তিনি তাঁহার জীবন দিয়া তাহাকে সুখী করিতে চাহিলেন। আর যমুনা?

যমুনা ভাবিল—"এ কি? স্বপ্নেও যাহা কল্পনা করিতে সাহস

করি নাই, বিধির মনে কি তাহাই থাকিতে পারে? না, এ অতি অসম্ভব। উনি আমার দুঃখ দেখিয়াই দয়া করিয়াছেন। দয়া করিবার কি অন্য কোনও পন্থা ছিল না? দয়া করিয়া কি কাহাকেও বিবাহ করা যায়? বিবাহ কি এমনই ঘৃণার জিনিষ?" —যমুনা চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল।

শরৎকুমার ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার প্রস্তাবে যমুনা লজ্জাবিজড়িত পুলকে অস্থির হইবে। কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাহার মুখমণ্ডল শ্রাবণের আকাশের মত গম্ভীর ও মেঘমলিন হইয়া আসিতেছে, তখন তিনি ব্যথিত হইলেন। বলিলেন—"তোমার অপ্রিয় হবে মনে করে বলি নি। উত্তর দেবে না?"

শরতের স্বরে যে একটু বিরক্তিপূর্ণ অধৈর্য্যের আভাস ছিল, তাহা যমুনার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে দৃঢ় অবিকম্পিত স্বরে বলিল—"না।"

"কেন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

কেন তাহা যমুনা কেমন করিয়া বুঝাইবে? সে বলিল— "তুমি অসুখী হবে!"

"এটা কি তোমার ভবিষ্যৎ বাণী নাকি?"

এ বিদ্রূপ যমুনার ভাল লাগিল না। সে শুধু বলিল—"আমার কেউ নেই। যার কেউ নেই তার আবার বিবাহ কি? আমি বিবাহ করব না।"

সে দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। শরৎ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অভিমানে তাঁহার গণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া

উঠিল। প্রত্যাখ্যান? যমুনা প্রত্যাখ্যান করিল? আমার এই সর্ব্বস্ব-দান উপেক্ষা করিতে তাহার একটুও দ্বিধা হইল না? এমনই অকৃতজ্ঞ সংসার!—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শরৎকুমার বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন।

(৪)

যমুনা দুরন্ত ব্যাধির কবলে পতিত হইয়াছে। বিমলার অত্যাচারে, শরতের ব্যবহারে ভবিষ্যতের বিভীষিকাপূর্ণ ভাবনায় তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে। অসহনীয় চিন্তার ক্লেশে সে কুসুমদাম শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে জ্বর দেখা দিল।

বাল্যকাল হইতে শরৎকে সে আদর্শ বলিয়া জানিত। তাহার রূপের মত রূপ বুঝি হয় না। এমন মিষ্ট কথা সে আর শুনে নাই। শরতের নিকট বসিয়া সে যখন গল্প শুনিত, তখন শুধু অনিমেষ নয়নে শরতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত; আর মনে করিত, যে রমণী শরৎকে পতিরূপে পাইবে, জগতের মধ্যে তার মত সৌভাগ্যবতী আর কেহ নাই।

কিন্তু শরৎকুমারের প্রস্তাবে তাহার মন কিছুতেই সায় দিতে পারিল না। শরৎ তাহার দুঃখে দুঃখী, প্রাণ দিয়া তাহার উপকার করিতে প্রস্তুত। কিন্তু যমুনা আর যে-কোনও উপকার শরতের নিকট হইতে অম্লানবদনে লইতে পারিত। বিবাহ কি কখনও ভিক্ষা লওয়া চলে? দয়া কি কখনও প্রেমের স্থান লইতে পারে? শরৎ ভালবাসিয়া ত বিবাহ করিতে চাহে নাই।

যমুনার জ্বর প্রবল হইতে লাগিল। শরৎ সংবাদ পাইয়া চিকিৎসক ডাকাইয়া দিলেন, নিজে একবারও দেখিতে আসিলেন না। ভাবিলেন, যমুনা তাঁহাকে চাহে না। অভিমান-সম্বল যুবক প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই যে মুখের ভাষা হৃদয়ের ভাবই ব্যক্ত করে। যমুনার প্রত্যাখ্যানকে এত বড় করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন যে আসল কথাটা তলাইয়া দেখেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন—আমার উদারতা, আমার সর্ব্বস্বদান যমুনা হেলায় উপেক্ষা করিল; সুতরাং আমি আমার মহত্ত্বকে আর লাঞ্ছিত করিব না। তিনি বুঝেন নাই যে, যমুনা বহুদিন হইতে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া ছিল। তাহার অতুলনীয় রূপরাশি, তাহার আয়তলোচনের মোহনভঙ্গী, সদ্যবিকসিত যৌবন—এ সকলই তাঁহার হৃদয়ে ধীরে ধীরে একখানি মাধুর্য্যের ছবি আঁকিয়া দিতেছিল। সেই তনুহীন দুষ্ট ঠাকুরটী যে তাঁহার ফুলের ধনুখানি এদিকে একটু বাকাইয়া ছিলেন, শরৎ তাহা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। এখন প্রত্যাখ্যাত হইয়া ক্রমে সে অচিন্তিত পূর্ব্ব চিন্তা তাঁহার মনে ধূমায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। যমুনাকে না পাইলে যে জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়, এই কথাটি ক্রমে তাহার মনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। ইচ্ছা হইত, ছুটিয়া গিয়া যমুনাকে সব খুলিয়া বলেন; কিন্তু অভিমান আসিয়া পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। আবার যদি সে প্রত্যাখ্যান করে!

একদিন যমুনার অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িল। সে বুঝিল যে, জীবনবর্ত্তি এইবারে নিভিয়া আসিতেছে। বিমলাকে

ডাকিয়া পাঠাইল, মরিবার পূর্ব্বে তাহার ক্ষমা চাহিয়া লইবে। উত্তরে বিমলা যাহা বলিল, তাহাতে সে আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। চিকিৎসক শরৎকুমারকে তাঁহার আশঙ্কার কথা জানাইলেন; জ্বরত্যাগের সময় বিপদের সম্ভাবনা। রোগিণী প্রলাপ বকিতে বকিতে অনেক সময় তাঁহারই নাম করে, তাঁহারই দর্শন কামনা করে, এ কথাও চিকিৎসক বলিয়া গেলেন। প্রকারান্তরে যমুনাকে একবার দেখা শরৎকুমারের উচিত একথা বলিতে বৃদ্ধ ভুলিলেন না।

চিকিৎসককে বিদায় দিয়া শরৎকুমার নির্জ্জনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাই ত! আমিই কি শেষে বালিকার মৃত্যুর কারণ হইলাম! যমুনা কি আমাকে ভালবাসিত? তবে আমাকে অমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করিল কেন? কিন্তু সত্যই কি সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল? তাহা ত নয়! আমি অসুখী হইব ভাবিয়াই সে বোধ হয় সম্মত হয় নাই। সে ত স্পষ্ট বলিয়াছিল যাহার কেহ নাই তাহার আবার বিবাহ কি? হায় হায়, কি করিতে কি করিলাম!

আর কালবিলম্ব না করিয়া শরৎকুমার যমুনার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন যমুনা জ্বরঘোরে প্রলাপ বকিতেছিল। শরৎ শয্যার উপর বসিয়া যমুনার হস্ত দুখানি নিজহস্তে লইলেন। যমুনা চাহিল না। শরৎ ডাকিলেন, সে চিনিতে পারিল না। কিন্তু তাহার সজল দুটি নয়ন বারংবার দরজার দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল। যেন সে কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। একবার কাতরস্বরে

বলিয়া উঠিল—"ওগো, কেউ তাঁকে ডেকে এনে দাও না।" শরৎ নিজ হস্তে ঔষধ তাহার মুখে ধরিলেন, সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

সারারাত্রি শরৎ রোগিণীর সেবা করিলেন। প্রত্যূষে শুশ্রূষা-কারিণীকে বিদায় দিয়া তিনি একাকী পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

ভোরের আলো যমুনার ম্লান মুখে পড়িয়াছে, ভোরের বাতাস তাহার অলকদাম দুলাইয়া দিতেছে। তাহার জ্বরত্যাগ হইয়া আসিতেছিল, শরৎকুমার শিয়রে বসিয়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন। যমুনা চক্ষু মেলিল। পরক্ষণেই সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। অপাঙ্গ বাহিয়া অশ্রুধারা ছুটিল, শরৎকুমার পুনঃ পুনঃ তাহা সযত্নে মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। বলিলেন—"যমুনা, আমার অপরাধ ক্ষমা কর।"

যমুনা উপাধান হইতে মস্তক তুলিয়া একবার ভাল করিয়া তাঁহাকে দেখিল, বলিল—"তুমিই আমার অপরাধ ক্ষমা কোরো। আমি তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি। তুমি বল আমায় ক্ষমা করলে, তা হলে আমি সুখে মরতে পারি।"

শরৎ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। আজ সেদিনকার ব্যস্ততা নাই, অভিমান নাই, মহত্ত্বের গর্ব্ব নাই। আজ শরৎকুমার আপনাকে ভুলিয়াছেন। এ কয়দিনের মর্ম্মদাহ তাঁহার মনের মলা ভস্মসাৎ করিয়া দিয়া গিয়াছে। আজ তিনি একান্ত আবেগভরে যমুনার শীর্ণ দেহখানি টানিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার অজস্র অশ্রু যমুনার ললাট ও গণ্ড সিঞ্চিত করিয়া দিল।

তিনি বলিলেন—"যমুনা একবার বল, আমাকে বিবাহ করবে।

আজ আর না বোলো না। যদি হৃদয় খুলে তোমায় দেখাতে পারতাম!”

প্রভাতবায়ু যমুনার গণ্ডে স্নেহকর বুলাইয়া দিল। সে তাহার ক্ষীণ হস্তে শরতের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া মৃদু হাসিল। সে হাসিল, অদূরবর্ত্তী মরণের কথা ভাবিয়া। মৃত্যুর যিনি দেবতা তিনিও বোধ হয় হাসিলেন।

যমুনা ক্রমেই আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। তারপর একদিন জোৎস্না-পুলকিত সন্ধ্যায় শরৎকুমার যমুনাকে বিবাহ করিলেন।

(৫)

যমুনার বিবাহের পর তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। সমাজ তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া শরৎকুমারকে নিপীড়িত করিল। শেষে সময়ের প্রভাবে সমস্ত ক্ষত মিটিয়া যাইতে লাগিল। মিটিল না কেবল বিমলার হৃদয়ের ক্ষত।

যমুনার বিবাহের পর হইতে বিমলার ব্যবহার বদলাইয়া গিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল যে যমুনার সহিত আর গোলযোগ করিলে তাহাকেই পস্তাইতে হইবে। সুতরাং সে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যমুনার মন যোগাইয়া চলিতে লাগিল—কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কিসে তাহার সর্ব্বনাশ করিবে। হিংসায় একবার যাহার মনে আগুন জ্বালাইয়াছে, প্রতিহিংসা নহিলে তার সে আগুন নিবে না। বিমলা মনে মনে যমুনা ও শরৎকুমারের

সর্ব্বনাশ কামনা করিতে লাগিল; একটি অপূর্ব্ব সুযোগও ঘটিল।

যমুনা মাঝে মাঝে ঘাটে গিয়া একজন অপরিচিত পুরুষের সহিত কথা কহে, বিমলা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। কিন্তু প্রথমে সে কাহাকেও বলিল না। প্রণয় বেশ ঘনাইয়া আসুক, তারপর শরৎকে বলিয়া তাহার ভালমত শ্রাদ্ধ করিবে, এই আশাই সে পোষণ করিতে লাগিল।

সত্যই যমুনা একটি গুরুতর অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া এখানে বলা দরকার। তখনও যমুনার বিবাহ হয় নাই। একদিন বিমলার বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া যখন সে ঘাটে বসিয়া নির্জ্জনে অশ্রুমোচন করিতেছিল, তখন হঠাৎ একটি যুবক হস্ত পদ প্রক্ষালন করিবার ছলে তাহারই নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। যমুনা সংকুচিত হইয়া পড়িল এবং কলসী পূর্ণ করিয়া লইয়া ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইল। তখন সেই অপরিচিত ব্যক্তি মৃদুস্বরে ডাকিল "শান্তি।" যমুনা শুনিল কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। 'শান্তি' নাম যেন তাহার কত পরিচিত, অথচ সে মনে করিতে পারিল না কোথায় সে নাম শুনিয়াছে। সে ভাবিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

"শান্তি, আমায় লজ্জা কি? তুমি যে আমারই বোন্।"

যমুনা ততক্ষণ সোপানের দুই তিনটি স্তর অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু শেষের কথা কয়টি শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে এই কথা কয়টি যেন কাঁদিয়া

কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল "তুমি যে আমারই বোন্।" সংসারে যাহার কেহ নাই, তাহার প্রাণ যে একটি আপনার জনের জন্য কেমন করিয়া আকুলি বিকুলি করিয়া বেড়ায় তাহা সমস্ত বেদনার সাক্ষী যিনি, সেই অন্তর্যামীই জানেন।

অপরিচিত বলিল—"আমরা এক মায়ের সন্তান। দুজনে বন্যায় ভেসে এসেছিলাম। তোমার সে কথা মনে নাই। তুমি যে তখন বড় ছোট্ট। আমায় যিনি উদ্ধার করেছিলেন তিনি একজন সামান্য গৃহস্থ। তাঁরই বাড়ীতে কৃষকের কাজ করে আমি মানুষ হয়েছি। তোমাকে যেদিন এই ঘাটে প্রথম দেখি, সেই দিনই আমি চিনতে পারলাম। তবে তুমি বড় মানুষের বাড়ীতে আছ বলে আমি দেখা দিইনি; হয়ত কে কি বলবে! আজ তোমায় কাঁদতে দেখে আমার মনে হল বুঝি তোমার অদৃষ্টেও সুখ নেই।"—সে চক্ষু মুছিল।

যমুনা কোনও কথা বলিল না। দুঃখের অশ্রুবিন্দু কেমন করিয়া কখন সহসা আনন্দের অশ্রুতে পরিণত হইল তাহাও সে বালিকা বুঝিতে পারিল না। শৈশবের স্মৃতি নিতান্ত ক্ষীণ আলোক-রেখার মত তাহার মনের অন্ধকার কক্ষে একটি অস্পষ্ট ছায়াপাত করিল। প্রভাতের ঘন কুয়াসা যখন তাহার জালটি ধীরে ধীরে গুটাইয়া লয়, তখন যেমন একটু একটু করিয়া দূরের বস্তু অস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিতে থাকে, যমুনার মনে তেমনই যেন কোনও বিস্মৃত লোকের অস্পষ্ট চিত্র ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইল। সে সেই ছায়ালোকে তাহার ভ্রাতার কিশোর মুখখানি

দেখিতে পাইল। আর তাহার মনে কোনও সন্দেহ রহিল না।

যমুনা ধীরে ধীরে বাড়ী চলিয়া গেল। সেই অবধি মাঝে মাঝে ভ্রাতার সহিত এই পুষ্করিণীতে দেখা হইত। উভয়ে উভয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিত। যমুনার বিবাহে তাহার দাদা খুব খুসী হইয়াছিল।

যমুনা অন্যায় করিল,—তাহার এই ভাইয়ের সম্বন্ধে শরৎ-কুমারকে সে কিছুই বলিল না। কতদিন ভাবিয়াছে আজ বলিব; তাঁহাকে বলিলে তিনি আমার ভাইকেও আশ্রয় দিবেন। কিন্তু বলি বলি করিয়া বলা হইল না। রমণীসুলভ অহঙ্কার তাহাকে কুবুদ্ধি দিল। তাহার ভাই যে কৃষকের গৃহে কৃষকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, কেমন করিয়া সে এ কথা স্বামীর নিকট প্রকাশ করিবে? যদি তিনি ঘৃণা করেন! যদি জাতির কথা আবার উঠে, তাহা হইলে সে যে মরণের অধিক কষ্টকর হইবে! যমুনা সাহস করিয়া উঠিতে পারিল না, বুঝিল না শরতের মত স্বামীর কাছে, এমন দেবোপম চরিত্রের কাছে আমার আবার অপমান কি? রমণীরা মাঝে মাঝে ভুলিয়া যান যে, প্রেমের কোমল ফুলে অভিমান-পতঙ্গের ভর সহে না। সন্দেহের ক্রুর নিঃশ্বাস লাগিলে সে ফুল শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে।

এখানেও তাহাই ঘটিল। বিমলা শরৎকুমারের মনে সন্দেহের বীজ বপন করিয়া দিল। প্রথমতঃ তিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই, বরং বিমলাকে তিরস্কার করিয়া বিদায় করিয়াছিলেন।

কিন্তু অন্য সূত্রেও তিনি যখন জানিতে পারিলেন, তখন আর ইহাকে কোনও মতে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিলেন না। যমুনাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন, কিন্তু ঘৃণা হইল। ভাবিলেন, এত প্রেম, এত স্বার্থত্যাগ, ইহার বিনিময়ে যাহার নিকট অবিশ্বাস লাভ করিলাম, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার কিছু আছে কি?

শরৎকুমার স্বাস্থ্যভঙ্গের দোহাই দিয়া ক্রমশঃ যমুনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। যমুনা শতচেষ্টা করিয়াও অসুখের কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। শরতের ব্যাধি যে মানসিক, তাহা সে কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিল। মনে করিল, হয়ত এতদিনে আমার প্রতি উহাঁর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। নহিলে আর কাছে আসেন না কেন? আর তেমন করিয়া ভালবাসেন না কেন? এতদিন হাস্যমুখে দুজনে অদৃষ্টকে পরিহাস করিয়াছেন, এখন কি তবে অনুশোচনা আসিল? যমুনা নিজের জন্য তত ভাবিল না—তাহার দু' মাসের শিশু পুত্রটির কথা ভাবিয়া সে বিচলিত হইল, তাহাকেও তিনি একবার দেখিবেন না কেন? শরৎ এখন আর অন্দরের দিকে আসেন না।

যমুনার শরীরও চিন্তায় এবং অভিমানে শীর্ণ হইতে লাগিল। কেবল বিমলা হর্যযুক্ত হইল। তাহার এই আকস্মিক হর্ষের কারণ যমুনা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন সমস্ত ব্যাপারটা তাহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। সে দুপুর বেলা ঘাটে জল আনিতে গিয়াছে; তাহার দাদা অন্য দিনের মত তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে। তেমন সময় ঘাটে কেহ থাকে

না। যমুনা তাহার সুখ দুঃখের কথা তাহাকে বলিতেছিল। যমুনা জল লইয়া যেমন গৃহের দিকে ফিরিবে, তেমনি দেখিতে পাইল বিমলা ঊর্দ্ধশ্বাসে বাগানের ভিতর দিয়া খিড়কির দরজা পার হইল। যমুনা এক নিমেষের মধ্যে বুঝিতে পারিল যে বিমলাই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কিন্তু তাহার মন একদিকে যেমন ভয়ে ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিতেছিল, অপরদিকে তেমনি তাহাতে একটু আশার রশ্মি দেখা দিল। সে মনে করিল, আজ সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিলে তিনি আমায় নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন। বিমলার সঙ্গে আজ শরৎকুমারও যে তাহাদের মিলন দেখিয়াছেন, অভাগিনী তাহা জানিতে পারে নাই।

যমুনা বাটী ফিরিয়া অধীরভাবে সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর যখন বাহিরের লোক সব চলিয়া গেল, তখন বহির্ব্বাটীর দ্বিতল কক্ষের দ্বারে সুপ্ত সন্তানকে বক্ষে লইয়া যমুনা উপস্থিত হইল। দেখিল ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ। অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সে দ্বারে আঘাত করিল। একজন ভৃত্য দ্বার খুলিয়া দিল বটে; কিন্তু "বাবু এখনই মফঃস্বল যাইবেন। দরজা খুলিবার হুকুম নেই।" এই বলিয়া পুনরায় দরজা বন্ধ করিল।

যমুনা বজ্রাহতের মত সেই অন্ধকার সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া রহিল আর মনে মনে কেবলই নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল "কেন, এতদিন বলিনি? এমন অগাধ বিশ্বাস নিজের দোষেই সব হারিয়ে ফেলেছি। হায় হায় আমার দোষেই সব গেল।"

নিশা যখন অবসান প্রায়, তখন দরজা খুলিল। একটি

চাকর ছোট একটি তোরঙ্গ মাথায় করিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে আসিল। যমুনা শিশু কোলে স্বামীর পদতলে পতিত হইয়া বলিল, "আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি সকল কথাই বল্‌ছি।"

শরৎকুমার বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন "আমায় তোমার কিছুই বল্‌তে হবে না। যা বল্‌তে হয় ভগবানকে বোলো।"

যমুনা উঠিয়া শরৎকুমারের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। বলিল "একদিন আমায় দয়া করে আশ্রয় দিয়েছিলে—"

শরৎকুমার রুক্ষভাবে বলিলেন "সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যই যাচ্চি।"

যমুনা করজোড়ে বলিল, "আমি বড়ই হতভাগিনী। না জেনে তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি। তুমি একদিন আমার জন্য কত কষ্ট সয়েছ, কত অপমান লাঞ্ছনাভোগ করেছ,—"

"তার জন্যে দুটো মিষ্ট কথা বলে' আবার আমার মন ভুলাতে পারবে যদি মনে করে থাক, তবে সেটা তোমার মস্ত ভুল।"

"আমি তোমার মন ভুলাতে চাই নি। ওগো একটিবার আমার কথা শোনো, একটিবার আমায় বলতে দেও—"

"তোমার কথা অনেকদিন শুনেছি, আর নয়। আমার সময় নেই, সময় নেই। হাঁ, দেখ, একটি কথা যাবার সময় বলে যাই—তোমার সঙ্গে আমার যে বিবাহ, তাহা কোনও ধর্ম্ম অনুসারেই হয় নি। কারণ কুলশীল গোত্র না জানলে সে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। তুমি হিন্দু, কি মুসলমান, কি কি, তাও জানিনে। সুতরাং তুমি এখনও যাকে ইচ্ছে বিবাহ করতে পার। আমি তোমাকে

যে সকল অলঙ্কার দিয়েছি, তা' ফিরিয়ে দিতে হবে না। আর ঐ জারজ সন্তান—"

যমুনা আর কিছু শুনিতে পাইল না। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া, ভাবনায় ত্রাসে তাহার শরীর ক্রমেই অসাড় হইয়া আসিয়াছিল। এবারে সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া শরতের চরণ তলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার কোনও কথাই বলা হইল না। শরৎকুমার সিঁড়ি দিয়া দ্রুত নামিয়া গেলেন। শিশুর ক্রন্দনও মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না।

(৬)

শরৎকুমারের গৃহত্যাগের পর দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। যমুনা এখনও বাঁচিয়া আছে—নিজের জন্য নহে ; তাহার প্রাণের দুলাল পুত্রটির জন্য। কিন্তু এমন হইয়া উঠিয়াছে যে সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রটিকেও হয়ত আর বাঁচাইতে পারে না। অনাহারে, চিকিৎসার অভাবে সেও মরিতে বসিয়াছে।

রায় বাড়ীর সে অবস্থা আর নাই। সে কোলাহলমুখরিত পুরী এখন নিস্তব্ধ, মলিন ও শ্রীহীন। লোকজনের যাতায়াত অভাবে পথে ঘাস জন্মিয়াছে। কর্ম্মচারীরা বাড়ী বসিয়াই জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখিতেন ও নিজ নিজ সংসারের উন্নতি সাধন করিতেন। মনীব যাহার প্রতি বিমুখ, চাকর তাহাকে লাঞ্ছিতই করে। বিমলা তাহার মাসহারা নিয়মমত পাইত ; কিন্তু যমুনার দিকে

সে একবার ফিরিয়াও চাহিত না। যমুনা হইতেই ত তাহার বাপের ভিটা উৎসন্ন হইল! সে এখন আর বড় ঝগড়াও করে না। কারণ, অভিনয়ে দর্শক না জুটিলে অভিনয় জমে না; কেহ ত আর আসে না। আশা নাই, তাই আর আসে না। কুটুম্ব-কন্যাগণ একে একে চলিয়া গিয়াছে। বিমলা সঙ্গিনীদের অভাবে কষ্ট বোধ করিতে লাগিল, অবশেষে সে অপরাহ্নে পাড়ায় যাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়ে কোথাও সে আদর পাইল না। সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং যদি রিক্ত হস্তে কাহারও দ্বারস্থ হন, তবে তাঁহাকে কেহ পাণগুয়া দিয়া সম্ভাষণ করে কি না সন্দেহ।

যমুনার দিনগুলি অতি কষ্টেই কাটিয়া যাইতেছে, এখন তাহার ভ্রাতাই তাহার অন্নবস্ত্র যোগাইতেছে। সে আর পুকুরঘাটে যমুনার সহিত সাক্ষাৎ করে না; সে এখন বাড়ীতেই আসে এবং অধিকাংশ সময় রুগ্ন ছেলেটিকে কোলে করিয়া কাটায়। এখন সকলেই জানে যে, হীরালাল যমুনার ভ্রাতা। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে সে কৃষকের কাজ করিত। তাহাও সকলে জানিত। তাহারই জন্য যে শরৎকুমার গৃহত্যাগী, সেটুকু আর কেহ জানিত না। বিমলা যখন প্রথম শুনিল যে এই ব্যক্তি যমুনার ভ্রাতা, তখন সে অনু-তাপের জ্বালায় মরিয়া গেল?—মোটেই নয়। সে শুধু ঘৃণায় মুখ ফিরাইল। তাহার ভ্রাতা যে যমুনাকে বিবাহ করিয়া ভয়ানক অন্যায় করিয়াছে, এই নীচ জাতীয় কুটুম্বের দ্বারা তাহাই আরও ভাল করিয়া প্রমাণিত হইল।

ছেলেটির রুগ্ন বিশীর্ণ দেহ কোলে লইয়া যমুনা অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। তাহার যে সান্ত্বনার কিছুই ছিল না! বন্যায় যখন সে ভাসিয়া আসিয়াছিল, তখন বিধাতা তাহাকে বাঁচাইলেন কি এরই জন্য? তাহার ভাগ্যে যে সুখ মিলিয়াছিল, সে সুখ রাজার মেয়েরও হয় না। কিন্তু কোথায় গেল সে সব? এমন করিয়া কাচের বাসনের মত সব চুরমার হইয়া গেল কি অপরাধে? সেই আদর, সেই স্বর্গ; সেই দুর্ল্লভ স্নেহ, সেই অতুল প্রণয়—সে যেন এক স্বপ্ন! স্বপ্ন যদি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবে আর কিসের জন্য জীবন?

যমুনা তাহার সম্পদের কথা ভুলিয়া গেল। কৃষকের ভগিনী কৃষকবালার ন্যায় দিন যাপন করিতে লাগিল। দাসদাসী সব চলিয়া গিয়াছে. সে নিজেই সমস্ত গৃহকর্ম্ম করে। কোনও দিন রাঁধে, কোনও দিন রাঁধে না। ছেলের পথ্য রাঁধিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া নিজে গিয়া শুইয়া পড়ে। এমনি করিয়া শরীরকে ক্ষীণ করিয়া সে অবশ্যম্ভাবীর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। পাড়ার বধূরা তাহার দুঃখ দেখিয়া চোখের জল ফেলিত, সেও দুই এক ফোঁটা চোখের জলে তাহার সমস্ত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আসিত, তাহার সে রূপরাশি কোথায় চলিয়া গিয়াছে—এখন তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারা যায় না।

যমুনা শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। হীরালাল, রায় পরিবারের পুরাতন চিকিৎসকের পায়ে জড়াইয়া ধরিল। তিনি এতদিন অল্প স্বল্প

দক্ষিণা লইয়া যমুনার ছেলেকে দেখিতেছিলেন,যমুনার অবস্থা দেখিয়া এবারে তাঁহারও দয়া হইল। তিনি বিনামূল্যে যমুনার চিকিৎসা করিতে প্রস্তুত হইলেন। দাদার অসন্তুষ্টির ভয়ে যমুনা মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু ঔষধগু'ল সমস্তই সে তাকের উপর তুলিয়া রাখিত, খাইত না। ঔষধ খাইয়া এ কষ্টের জীবন রাখিতে হইবে? ছেলের কথা মনে হইত কিন্তু সেও যে চলিয়া যাইতে বসিয়াছে, তবে আর বাঁচিয়া কি লাভ? স্বামীর মনে ব্যথা দিয়া, স্বামীকে গৃহত্যাগী করিয়া কোন রমণীর বাঁচিয়া থাকিতে সাধ হয়? যমুনার একমাত্র দুঃখ যে মরিবার পূর্ব্বে স্বামীর দেখা পাইল না। যমুনার অসুখ ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

এইভাবে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। বর্ষার গতিকে লোকের গৃহ হইতে গৃহান্তরে গতায়াত রহিত। আকাশ সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন, পথ পিচ্ছিল ও পঙ্কিল। এমনই দুর্দ্দিনে নন্দনপুরের রায়ভবনে বিপদের ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল। যমুনা বুঝিতে পারিল, তাহার শরীর যেন বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সে তাহাতে দুঃখিত হইল না, কেবল তাহার কম্পিত করযোড় ঊর্দ্ধে তুলিয়া ভগবানকে ডাকিল—"একবার, আর একটিবার তাঁহার দর্শন মিলে না?"

তাহার কাতর প্রার্থনা ভগবান শুনিলেন। বহুদিন পরে নন্দনপুরের সংকীর্ণপথে এই দুর্য্যোগসঙ্কুলা তামসী রজনীতে শরৎ-কুমারের পদদ্বয় যেন আর চলিতেছিল না। অনেক দিন পরে জন্মভূমি দেখিবার সাধ হইয়াছে, তাই এই অন্ধকারময় নিশীথে

গ্রাম্যপথে নিজ বাড়ীর দিকে শরৎকুমার অতি কষ্টে অগ্রসর হইতেছিলেন।

যখন তিনি বহির্ব্বাটীতে কাহারও সাড়া পাইলেন না, তখন তাঁহার বিবাগী মনও কাঁপিয়া উঠিল। তিনি অন্দরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। দরজাগুলি কতক খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে, কতক উন্মুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং প্রবেশ করিতে তাঁহার বাধা হইল না। অন্দরের উঠান ঘাসে ও গুল্মে পরিপূর্ণ হইয়াছে, প্রাচীরগুলি শৈবালাচ্ছন্ন, ভেকের রব ব্যতীত সমস্ত নিস্তব্ধ। শরৎকুমারের চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সবই যেমনকার তেমনই আছে, শুধু তিনিই নাই। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে অতি বড় নিষ্ঠুরের মনও গলিয়া যায়।

তিনি ভাবিতেছিলেন; এমন সময় মনুষ্য কণ্ঠের স্বর শ্রুত হইল। যমুনা বিবাহের পূর্ব্বে যে ঘরটিতে শুইত, সেই ঘর হইতে আওয়াজ আসিতেছিল। শরৎকুমার অগ্রসর হইলেন। গৃহদ্বার উন্মুক্ত ছিল। ক্ষীণ প্রদীপালোকে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হইয়া গেল। যমুনাকে দেখিতে না পাইলেও তাহার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলেন। আর সেই,—সেই যুবক তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট। তিনি ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

সেই সময় হীরালাল কথা কহিল—"আজ তিন চার দিন কত বলে কয়েও কিছু খাওয়াতে পারি নি; এই গভীর রাত্রে কোথায় কি পাব বোন্?"

"কিছু খেতে দেও, দাদা, বড় খিদে"—এই কয়টি কথা বলিতেই যমুনা শ্রান্ত হইয়া পড়িল।

তাহার দাদা বলিল—"এই রাত্রিটুকু কষ্ট করে থাক্, লক্ষ্মী দিদি আমার! আর কথা ক'স না।"

হঠাৎ শিশুটি কাঁদিয়া উঠিল। যমুনা তাহাকে কম্পিত হস্তে বক্ষে চাপিয়া বলিল—"দাদা, এই আমার শেষ; পার যদি একে বাঁচাও। তিনি যদি কখনও ফিরে আসেন, বোলো—"

সে আর বলিতে পারিল না, ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। শরৎ-কুমার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হীরালাল তাঁহাকে দেখিয়া চিনিল এবং ইঙ্গিত করিয়া কথা কহিতে নিষেধ করিল।

হীরালাল শরতের গৃহত্যাগের কারণ কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল। সে-ই যে যমুনার এত কষ্টের হেতু, তাহা মনে করিয়া সে আপনার জীবনে ধিক্কার দিত। শরতের গৃহত্যাগের পর হীরালালকে কেহ হাসিতে দেখে নাই। আজ শরৎকুমারকে দেখিয়া তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। শরৎকুমার তাহা লক্ষ্য করিলেন।

যমুনা আবার বলিল—"দাদা কিছু খেতে দাও, আর যে পারি নে—"

শরৎকুমার এবারে নিজ বস্ত্রের পুটুলি খুলিয়া মিছরি খণ্ড বাহির করিয়া হীরালালের হস্তে দিলেন। হীরালাল যত্নপূর্ব্বক তাহা যমুনাকে খাওয়াইল। সে একটু সুস্থ হইলে শরৎকুমার

তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। তাহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে পড়িল, এমনই আর একদিনের কথা—যেদিন চোখের জলে যমুনার প্রেম ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারই যমুনা, তাঁহারই পুত্র—আজ অনাথা, কাঙ্গালের মত মৃত্যুশয্যায় শায়িত। পরিতাপে তাঁহার বক্ষ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

রুদ্ধ ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া যমুনা চাহিয়া দেখিল,—এ কি স্বপ্ন! আবার চাহিল, আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। শেষে উন্মত্তের ন্যায় সে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল।

শরৎকুমার তাহাকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিলেন। তাঁহার মনে এখন আর অভিমান নাই, প্রতিহিংসা নাই। বৈরাগ্যে তাঁহার মন একান্ত উদাস হইয়া গিয়াছিল; আর আজ এই শোকাবহ পরিণাম দেখিয়া তিনি আপনাকে ভুলিয়া গেলেন।

যমুনা তাঁহাকে ক্ষীণ বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। তার পর সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শরৎকুমারও স্থির থাকিতে পারিলেন না। যমুনা বুঝিয়াছিল যে, আর একটু পরেই তাহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে। তাই সে প্রাণান্তিক চেষ্টা করিয়া শরৎকুমারের পায়ের উপর নিজের মস্তক রক্ষা করিল। বলিল—"সত্যই তুমি এসেছ? আর আমার মরতে কোনও কষ্ট নেই।"

হীরালাল সে দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। যমুনা তাহাকে বলিল—"দাদা, কেঁদ না, আমার সব সাধ পূরেছে।" শরতের

দিকে চাহিয়া বলিল—"আমার কথা বলা ফুরিয়ে এল। একটি কথা শুধু বলব, তাই বলবার জন্য বুঝি ভগবান আমার প্রাণ এখনও রেখেছেন। আমার দাদার প্রতি সন্দেহ কোরো না। মুখের দিকে চেয়ে দেখ, আমরা এক মায়ের পেটের সন্তান।"—যমুনা আর কিছু বলিতে পারিল না।

শরৎকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় উভয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তার পরে,—তার পরে সেই শয্যার প্রান্তে পড়িয়া যমুনার ক্ষীণ দেহযষ্টি সবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

নিশাপ্রভাতে যখন মেঘাপগমে দিগ্‌দিগন্ত অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, যখন বর্ষাপগতহর্ষ বিহঙ্গকুল নবীন উষার বাতাসে আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল, তখন সেই শান্ত, নিস্তব্ধ নির্ম্মল উষায় যমুনা চিরনিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িল। মৃত্যু তাহার মুখে মিলনের জ্যোতিঃ মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল।

পরিচয়

"বাবা, তুমি কথা কইছ না যে ?"

হরকান্ত বাবু আরাম কেদারায় শুইয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন। পাশে একটি টিপয়ের উপর চায়ের পেয়ালা, চুরুটের ভস্মাধার ও দুই একখানা খোলা চিঠি পড়িয়া ছিল। পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যা গৌরী পার্শ্বের একখানি চেয়ারের হাতলের উপর ভর দিয়া নিতান্ত অনুযোগের স্বরে দ্বিতীয়বার পিতাকে বলিল, "তুমি যে বড় কথা কইছ না ?"

হরকান্ত বাবু খবরের কাগজ খানি আরও একটু তুলিয়া ধরিয়া কন্যার দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। শেষে হতাশভাবে বলিলেন, "আমি আর কি বল্‌ব, মা ? যা হয় তোমরা কর গে।"

কন্যা বলিল, "তা হলে', মা যা খুসী করুক ?"—তাহার চক্ষু প্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু সঞ্চিত হইয়া টলমল করিতে লাগিল।

হরকান্ত বাবু জানিতেন, তাঁহার কন্যাটি বড় অভিমানিনী। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শোভারাণীও কম অভিমানিনী নন। শোভারাণী গৌরী অপেক্ষা তিন চার বছরের বড়; উভয়ের শোণিতই তরল। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে কাহারও পক্ষ অবলম্বন করিতে যাওয়া অপেক্ষা তিনি মৌনকেই অবলম্বন করা

নিরাপদ মনে করিলেন। শোভারাণী স্বভাবতঃই একটু খাম-খেয়ালী ; তার উপর স্বামীর সোহাগের মাত্রা কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হওয়ায়, তাহার মেজাজ একটু গরম হইয়া পড়িয়াছিল। হরকান্ত বাবু কিছু ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক ছিলেন, সংসারের নৌকাখানি তিনি স্থির জলে বেশ বাহিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু একটু ঝড় বাতাস উঠিলেই হাল ছাড়িয়া দিতেন।

আজ অকস্মাৎ বাতাস উঠিয়াছে—হরকান্ত বাবুর পুত্রকে লইয়া। তাঁহার একমাত্র পুত্র অমলকুমার বিমাতা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়াছিল ; সে ঝিয়ের হাত হইতে খাবারের পাত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে, তাহাকে প্রহার করিয়াছে ও নিজের জামা কাপড় ছিঁড়িয়া, ধূলা মাখিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। তাই শোভারাণী তাহাকে একটি ঘরে আবদ্ধ করিয়াছে। আট বছরের শিশু সেই শাস্তির বিরুদ্ধে প্রথমে বিদ্রোহ করিবার চেষ্টা করিল ; পরে নিরুপায় হইয়া সেই রুদ্ধ গৃহে কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। অন্য সময় হইলে, শোভারাণী এতক্ষণ হয় ত তাহাকে মুক্ত করিয়া দিত ; কিন্তু কন্যা যখন সেই বিদ্রোহী শিশুর পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে দশ কথা শুনাইয়া দিল, তখন শোভারাণীর হৃদয় কঠিন হইয়া উঠিল। সহোদরার স্নেহ যেন বিমাতাকে একান্ত পর করিয়া দিতে চাহিল। সেই জন্যই হরকান্ত বাবু তাহার অধি-কারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে বড়ই সংকোচ বোধ করিলেন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন হরকান্ত শোভারাণীর পাণিগ্রহণ করিলেন, তখন গৌরী প্রকাশ্য ভাবে বিরক্তি প্রকাশ করিতে ত্রুটী

করে নাই। সে এই বিবাহের পূর্ব্বেই শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল, আর এই সে দিন পিত্রালয়ে আসিয়াছে। কন্যার শ্বশুর শ্বাশুড়ী, স্বামী সকলেই যখন এই বিবাহের জন্য তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়া পড়িল, তখন হরকান্ত কন্যাকে আনিবার জন্য আর বিশেষ চেষ্টা করিলেন না; ভাবিলেন সময়ে সব মিটিয়া যাইবে। কিন্তু গৌরী এতদিন পরেও এবার স্ব-ইচ্ছায় পিতৃভবনে আসিয়া পূর্ব্বের সে অভিমান ভুলিতে পারিল না। কোনও ছল পাইলেই সে বিমাতাকে দু'কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িত না। হরকান্ত বাবু সবই লক্ষ্য করিতেন, কিন্তু কিছু বলিতেন না।

আজ প্রভাতেও পুত্রের ক্রন্দন, কন্যার অনুযোগ তাঁহার স্বাভাবিক ধৈর্য্য টলাইতে পারিল না। তিনি কন্যাকে তুষ্ট করিবার কোনও উপায়ই খুঁজিয়া পাইলেন না। গৌরী আহত অভিমান লইয়া ফিরিল। তার পরে যদিও শোভারাণী অমলকে মুক্ত করিয়া, তাহাকে শান্ত করিয়া, তাহার বেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া গৌরীর মানভঞ্জন করিতে গেল, কিন্তু গৌরীর মনে সন্ধি করিবার ভাব একটুও দেখা গেল না; সে কথাই কহিল না।

পরদিন সংবাদ পাইয়া গৌরীর স্বামী আসিলেন। গৌরী স্বামীর সহিত সেই দিনই যাত্রা করিবার জন্য পিতার অনুমতি পাইল। বিদায়ের কিছু পূর্ব্বে গৌরী পিতার নিকটে আবদার করিয়া বসিল—সে অমলকে লইয়া যাইবে। জামাতাও সে প্রার্থনা সমর্থন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। হরকান্ত বাবু

তাহাদের সংকল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া দিন কয়েকের জন্য পুত্রকে ছাড়িয়া দিতে আপত্তি করিতে পারিলেন না।

শোভারাণী এই দুই দিনে জীবনের একটা নূতন দিক দেখিয়া লইয়াছে। পূর্ব্বে সে কতবার খোকাকে শাসন করিয়াছে। কিন্তু কখনও ত এমনটি হয় নাই। এ যেন সংসারের মধ্যে সে নিতান্তই পর—এমনই ভাবে সকলে চলিতেছে। গৌরী ত উপেক্ষা-ভরে কথাই কহে না; অমলও সারাদিন দিদির অঞ্চল ধরিয়াই কাটায়। স্বামী এ দু'দিন কন্যার ভয়ে অন্দরের দিকেও ঘেঁসিতে পারেন নাই। শোভারাণীর সেই নিরবলম্ব, অসহায় অবস্থার মধ্যে আপনাকে বড়ই একলা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল যেন সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিতেছে যে এ সংসারে তাহার এতটুকু স্থান সকলের কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে।

তারপর যখন গৌরী অমলকে লইয়া বিজয়দর্পে যাত্রা করিল, তখন শোভারাণীর ক্ষুব্ধ অভিমান অন্তরের ভিতর যেন গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

(২)

অনেক দিন চলিয়া গেল; গৌরী বা অমল কেহই আসিল না। প্রথম প্রথম হরকান্তের বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। তিনি কিছুদিন পরেই খোকাকে আনিতে পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিল; গৌরী বলিয়া দিয়াছে, আর কিছুদিন যাক না, ব্যস্ত কি?

হরকান্তবাবুর গৃহে শিশুসন্তানদিগের কলরবের অভাব

ছিল না ; আত্মীয় স্বজনের পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই তাঁহার গৃহ মুখরিত থাকিত। কিন্তু সে কলরব সত্ত্বেও হরকান্ত বাবুর নিকট এক খোকার অভাবে গৃহটি যেন নিস্তব্ধ বলিয়া বোধ হইত। তিনি আবার কন্যাকে চিঠি লিখিলেন ; খোকাকে যেন অবিলম্বে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। চিঠির উত্তর আসিল ; খোকা আসিল না। গৌরী সংক্ষেপে জবাব দিয়াছে ; "খোকা এখানে বেশ আছে ; সে যাইতে চাহে না। বলরামপুর যাইবার নাম করিলেই সে কাঁদে। দু'মাসে তাহার চেহারা ফিরিয়া গিয়াছে। ঘরের ছেলে ঘরে ত ফিরে যাবেই ; তবু যে ক'দিন থাকে থাক্ না ! আমার কাছে খোকাকে রাখতে কি বিশ্বাস হয় না ?"

হরকান্ত ভাবিলেন, "সত্যই ত ! গৌরীর অভিমান হ'বারই কথা। মা নেই ; ভাই বোনে এক ঠাঁই থাকলে সে অভাবটা বোধ হয় ভুলে থাকতে পারে। যাক, আমারই না হয় কিছু কষ্ট হবে ; তারা ত থাকবে ভাল !"

তাঁহার মনে এরূপ ভাব হইবার আর একটি কারণ ছিল। শোভারাণী অমলের কথা বড় বলে না। এতদিন সে গিয়াছে, কই, একটিবারও তাহাকে আনিবার নামটি নাই ! যেখানে এত উপেক্ষা, সেখানে ছেলেকে আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি কি ?

শোভারাণীর মনের ভাব যাহাই হউক, সে কোন ক্রমে তাহা কাহাকেও বুঝিতে দিত না। অমল ভগিনীর গৃহে চলিয়া গেলে সংসার তাহার পক্ষে নেহাৎ ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইত। কিন্তু সে মনকে বুঝাইল যে, সে যতই করুক, ইহারা তাহাকে

আপন বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। তবে সে-ই বা কেন এমন করিয়া আপনাকে হীন করিবে? স্বামী কন্যাকে ভয় করিয়া চলিতে পারেন, সে ভয় করিয়া চলিবে কিসের জন্য? এ সংসার ত কন্যারও নয়, জামাতারও নয়। এ তাহার নিজের সংসার; সে যেমন করিয়া পারে, আপন অধিকার বজায় করিয়া লইবে।

প্রথমেই সে আলস্যকে দূর করিয়া দিল; সংসারের কাজে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত লাগিয়া গেল। এমনি করিয়া সে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ মমতাকে শীঘ্রই জয় করিয়া ফেলিল। স্বামীর দুঃখ সে বুঝিতে পারিয়াও, তাহাতে সহানুভূতির জলসেক করিত না। ভাবিত, কাজ কর্ম্মে মন দিলে, সব সারিয়া যাইবে। সে তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া স্বামীর মন হইতে বেদনার কণ্টকটি তুলিয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

শোভারাণীর উদ্দেশ্য হরকান্তের প্রবীণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। কিন্তু তাঁহার প্রবল, বলিষ্ঠ হৃদয় পত্নী-প্রেমের অনুপম আত্ম-দানে মোহিত না হইয়া পারিল না। শোভারাণীর অকৃত্রিম ভাল-বাসা বন্যার স্রোতের মত তাঁহার চিত্তকে দোলাইয়া, নাচাইয়া, ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

শোভারাণী এমনি করিয়া নিজের জন্য যে দুর্গটি নির্ম্মাণ করিয়া লইল, তাহার মধ্যেও লোকে তাহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না। পাড়ায় তাহাদের সম্বন্ধে কথা রটিতে লাগিল। ছেলে মেয়েকে তাড়াইয়া দিয়া সে যে রাক্ষসী-মায়ায় আবার স্বামীকে একেবারে গ্রাস করিতে বসিয়াছে, ইহাই নানা আকারে সর্ব্বত্র প্রচারিত

হইতে লাগিল। শোভারাণীর কাণে সে কথা উঠিল; সে কাঁদিতে কাঁদিতে ইহার প্রতিবাদ করিল। কিন্তু যখন তাহারই অন্নে প্রতিপালিতা শ্বাশুড়ী সম্পর্কীয়া পচুর মা বলিল, "তা বাছা পরের দোষ দিলে কি হবে? কচি ছেলেটাকে অমন করে' তার জন্মবারে বাড়ী থেকে বের করে' দিলে, আর বছর ঘুরে এল—এই আশ্বিনে আশ্বিনে এক বছর হলই ত গা?—তাকে আনবার নাম নেই! তারই ত বাড়ী ঘর, তারই ত সব। আমরা যেন তোমাদের খাই পরি, আমরা না হয় কিছু না বল্লুম, অপর লোকে চুপ করে থাকবে কেন? তারা দশ কথা বল্‌চেই ত! তোমার ভয়ে ছেলেটাকে বাড়ী আন্‌তে পারে না বটে, কিন্তু বাপের প্রাণ ত! ঐ সেদিন তোমাকে লুকিয়ে মেয়ের বাড়ীতে গিয়ে ছেলেকে দেখে এল। আহা এমন মানুষও ছিল নরকান্ত!"—পচুর মার স্বামীর নাম ছিল হরমোহন; সেই জন্য হরকান্তকে একটু রূপান্তর করা আবশ্যক হইয়াছিল।

তখন, শোভারাণীর মন লজ্জায় ঘৃণায়, ক্রোধে, গ্লানিতে ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। কিন্তু সে ভাব সে বাহিরে আর সপ্রকাশ হইতে দিল না।

মধ্যাহ্নে আহারের পর যখন হরকান্ত বিশ্রাম করেন, সেই সময় শোভারাণী অন্য দিনের মত তাঁহাকে যত্ন শুশ্রূষায় আপ্যায়িত করিতে করিতে বলিল, "একটি অনুরোধ রাখবে?"

"কি, বল। টিয়াপাখী না ময়না?"

"তোমার যে আর বায়না !"

"তবে বুঝি কিছু গয়না ?"

"সে সব কিছু চাই না। রহস্য রাখ, সত্যি, কথা রাখবে বল ?"

"না রাখলে তুমি ছাড়চ কই ?"

"তোমার দুটি পায়ে পড়ি, খোকাকে নিয়ে এস।"

হরকান্ত বাবু প্রার্থনাটিকে তেমন আন্তরিক বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। ইহার মধ্যে যেন একটু অভিনয়ের ভাব আছে, একটু বাড়াবাড়ির মত আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল খোকার কথা লইয়া ব্যঙ্গ তাঁহার ভাল লাগিল না। শোভারাণী তাঁহার স্কন্ধে হস্ত রক্ষা করিয়া বলিল, "বল, নিয়ে আসবে ?"

"আচ্ছা সে হবে এখন"—বলিয়া হরকান্তবাবু একটি চুরুট লইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন।

শোভারাণী জোর করিয়া কিছু বলিতে পারিতেছিল না। তাহার যে অপরাধ হইয়াছে, সে তাহা জানিত। এতদিন খোকার জন্য সে ত কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করে নাই ; এখন কি বলিয়া জেদ করিবে ?

শোভারাণী একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, "তুমি নিজে গেলে, খোকা আস্‌তে পারে। আর কাউকে পাঠালে তারা ছেড়ে দেবে না।"

একটু ব্যথা দিবার অভিপ্রায়ে হরকান্ত বলিলেন, "না দেয়, ভালই ত। সেখানে অমল ত বেশ আছে।"

শোভারাণী সে আঘাত সামলাইয়া লইল। বলিল, "তুমি তা

মনে কর জানি বলেই ত এতদিন কিছু বলিনি। কিন্তু ঘরের ছেলে আর কতকাল এমন করে বাড়ীছাড়া হয়ে থাকবে? আর এতে লোকেই বা আমাকে কি বলে, বল দেখি?"

"ওঃ—লোকে মন্দ বলে, তাই খোকাকে দেখতে ইচ্ছে হয়েছে?"

শোভারাণী ইহার কোনও উত্তর ভাবিয়া পাইল না, শুধু ছল ছল চোখ দুটি আনত করিয়া রহিল। হরকান্ত বলিলেন, "আচ্ছা আগে একটা চিঠি লিখে দেখি।"

সেই দিনই চিঠি লেখা হইল। প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে যে উত্তর আসিল, তাহাতে হরকান্তবাবু স্তম্ভিত হইলেন। গৌরী লিখিয়াছে, "খোকাকে কোথায় পাঠাইব? যেখানে স্নেহ মমতার লেশমাত্র নাই, সেখানে কি অমন মা-হারা ছেলে বাঁচে? আমি এবারে মাতার চরিত্র ভাল করিয়া বুঝিয়া আসিয়াছি, সে সব কথা আপনাকে বলিয়া কি হইবে? আপনার মোহ কাটিয়া গেলে আপনি সে সব পরে বুঝিতে পারিবেন এবং তখন আমার কথা ভাল লাগিবে! এখন আপনি ইচ্ছা করিলে অবশ্য আপনার ছেলেকে লইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু প্রাণের পুতুলকে বাঁচাইতে পারিবেন না।"

জামাতা নবগৌরাঙ্গ পত্নীর কথা সমর্থন করিয়া পৃথক পত্র লিখিয়াছে। শ্বশুর যে সম্প্রতি বিষয়কর্ম্মে পর্য্যন্ত অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এইরূপ জনরবের উল্লেখ করিয়া জামাতা তাঁহাকে পরকালের গতি সম্বন্ধেও উপদেশ দিতে ত্রুটী করে নাই।

সে পরিশেষে লিখিয়াছে, "অমলের লেখাপড়া আরম্ভ করিবার বয়স হইয়াছে। আমি মনে করি, বাড়ীতে ঝিয়ের হস্তে সমর্পণ করা অপেক্ষা তাহাকে কোনও বোর্ডিং স্কুলে রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পূজার পরেই তাহাকে বোলপুরে রাখিয়া দিয়া আসিব। আশা করি, আপনার অমত হইবে না।"

হরকান্তবাবু চিঠি দুইখানি শোভারাণীর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। শোভা পত্র দুখানি দু'তিনবার পাঠ করিল, তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া আসিল। সে নিজের লাঞ্ছনা উপেক্ষা করিতে পারিত; কিন্তু স্বামীর অপমানে তাহার চিত্ত একেবারে বিরূপ হইয়া উঠিল। আর অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এ প্রসঙ্গ হইল না।

শোভারাণী জানিত যে লোকনিন্দার ভয়ে হরকান্ত কন্যা জামাতাকে অসন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন না।

(৩)

সুদীর্ঘ সাতটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে বলরামপুরের রায় পরিবারে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। হরকান্তবাবু অল্পদিন পূর্ব্বে হঠাৎ মারা গিয়াছেন। এক বৎসর পূর্ব্বে অমলকুমার নবগৌরাঙ্গের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বিলাত পলায়ন করিয়াছে। বোম্বাই হইতে তারযোগে পিতাকে সংবাদ দিয়া তাহারা জাহাজে উঠিয়াছে। ইহাতে গৌরীর যে কিছু হাত ছিল না, তাহা হরকান্ত বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইলেন না। ছয় বৎসর বোলপুর আশ্রমে

অবস্থান কালে কয়েকবার মাত্র সে বাড়ী আসিয়াছিল, কোন বারেই ছ'দিনের বেশী বাড়ী থাকিতে পারে নাই। সে অবকাশ সময়ে ভগিনীর গৃহেই আসিত এবং ফিরিবার কালে পিতাকে দেখা দিয়া যাইত। কোনও কোনও বার নবগৌরাঙ্গ অথবা গৌরী সঙ্গে আসিত; সে সময়ে অমল বাড়ীতে আসিয়াও তাহাদের সঙ্গেই কাটাইত। শেষ ছ'বারে সে যখন আসিয়াছিল, তখন শোভা পিত্রালয়ে। ইহাতে কাহারও মনে ক্ষোভের কারণ হয় নাই; কারণ শোভা বাড়ীতে থাকিলেও অমল আর আগেকার মত তাহার কাছে আসিত না। শোভারাণীও মনে-মনে পূর্ব্বের ক্রোধ পোষণ করিয়া তাহার প্রতি কোনও দিন সস্নেহ ব্যবহার করে নাই।

হরকান্তবাবু যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন বিলাতের খরচ রীতিমত তিনিই পাঠাইতেন। সে খরচ কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও তিনি কোনও দিন কৃপণতা করেন নাই। তিনি জানিতেন যে তাঁহার প্রদত্ত অর্থের কতকাংশ নবগৌরাঙ্গের ভ্রাতার জন্য ব্যয়িত হইত, কিন্তু কন্যার সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারেই প্রতিবাদ করিবার মত সাহস তাঁহার ছিল না। তাঁহার উইলেও তিনি মুক্তহস্তে অমলের জন্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু ক্রমেই অমলের অর্থের অভাব বাড়িতে লাগিল। পূর্ব্বে যে খরচে ছ'জনের কুলাইত, শেষে সে অর্থে অমলের এক-লার কুলাইত না। শোভারাণী ও তাঁহার ভ্রাতা নিত্যানন্দকে হরকান্ত সম্পত্তির একজিকিউটার নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এ

ব্যবস্থায় অবশ্য গৌরী এবং তাহার স্বামী প্রতিবাদ করিতে ত্রুটী করে নাই ; কিন্তু মোকদ্দমা করিয়াও কোনও ফল হয় নাই। সুতরাং অমলকুমারকে মাতার উপরই নির্ভর করিতে হইল। কিন্তু সে কিছুতেই তাহাকে চিঠি লিখিতে পারিত না। নবগৌরাঙ্গকেই মধ্যস্থতা করিয়া অমলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইত। শোভারাণী বিশেষ প্রয়োজন মত অর্থ না দিয়া পারিতেন না, কিন্তু এমন ভাবে দিতেন যেন সে নিতান্ত অনিচ্ছার দান। গৌরী ও তাহার স্বামী ইহাতে বড়ই গ্লানি বোধ করিত।

শোভারাণী গোলে পড়িয়াছিলেন তাঁহার ভাইকে লইয়া, —তিনি নন্দনহাটীর উকীল। সেখানে থাকিয়া তিনি বলরামপুরের জমিদারী সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম্ম অনায়াসে দেখিতে শুনিতে পারিবেন, এই জন্যই হরকান্ত বাবু নিত্যানন্দকে একজিকিউটার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ যে বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবসায়ে লাগাইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তাহা ভগিনীপতির সম্পত্তির উপর অনুশীলন করিয়া অচিরে তাহার সমস্ত ভার নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিয়া ফেলিলেন। পুরাতন কর্ম্মচারীদিগকে একে একে বিদায় করিয়া দিয়া, নিজের লোক নিয়োজিত করিয়া, নিজের সুবিধা-মত ব্যবস্থা করিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে মোটেই কঠিন হইল না। ভগিনীকে বুঝাইলেন যে এ সকল তাঁহারই পরিণাম বিচার করিয়া করা হইতেছে। অমলকে টাকা দিবার সময় নিত্যানন্দের বিষম আপত্তি উঠিত। কিন্তু ভগিনীর এই দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করিয়া

নিত্যানন্দ অন্য বিষয়ে নিজের মত চালাইবার সুবিধা করিয়া লইতেন।

শোভারাণী স্বামীর মৃত্যুতে সংসারের সকল আসক্তিই হারাইয়াছেন। তাঁহার নিজেরও কোনও পুত্র কন্যা থাকিলে হয় ত অন্যরূপ হইতে পারিত। কিন্তু সংসারের একমাত্র অবলম্বন, স্নেহের একমাত্র বন্ধন পতিকে অকস্মাৎ হারাইয়া তাঁহার আর কোনও কামনাই রহিল না। বিবাহিত জীবনের কয়েকটা বৎসর তাহার পক্ষে বড়ই সুখে কাটিয়া গিয়াছিল। একটু আধটু অশান্তিতে তাহাদের দাম্পত্য সুখের বিশেষ ব্যাঘাত করিতে পারে নাই। স্বামীর একান্ত নির্ভরপূর্ণ মুক্ত অনাবিল ভালবাসা পাইয়া সে ধন্য হইয়াছিল, এবং নিজেও আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিয়া সে সেই ক্ষুদ্র কয়েকটি বৎসরে সুখের অবাধ স্রোত বহাইয়াছিল। এখন তাহার উপাসনার বস্তু—স্মৃতি! সেই স্মৃতিকে সবলে বক্ষে চাপিয়া অভাগিনী সংসারের আর সমস্ত বিষয়েই নির্লিপ্ত ছিল। নিত্যানন্দের উপর সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া সে আপন মনে দিন কাটাইত। নিত্যানন্দ সে সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিলেন বলরামপুরের তালুকগুলি ক্রমশঃ রাজস্বের দায়ে বিক্রয় হইতে লাগিল, এবং নিত্যানন্দ সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে ক্রয় করিয়া, নন্দনহাটীর মহকুমায় অনেকগুলি দ্বিতল ত্রিতল ভবন প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন! শোভারাণী কোনও উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বামীর কুলগুরুকে সংবাদ দিলেন ও শুভদিনে মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

এখন হইতেই জপতপেই তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত।

(৪)

বলরামপুরের রায়বাড়ী জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। সেখানে এখন আর কোনও দাস দাসী বা কর্ম্মচারী যাতাযাত করে না। বাহিরের একটী ঘরে গ্রামের ক্ষুদ্র পাঠশালায় গুরুমহাশয় দশ বারটি ছেলে লইয়া মাঝে মাঝে বসেন অপর গৃহগুলিতে সন্ধ্যা ও প্রাতে অগণিত পায়রা কলরব করে।

শোভারাণী এখন নন্দনহাটীতে ভ্রাতার গৃহে থাকেন। তাঁহার ইচ্ছা বলরামপুরে বাস করেন, কিন্তু একাকী অত বড় বাটীতে থাকা অসম্ভব। সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, সমস্ত গিয়াছে। দাসদাসী রাখিয়া স্বতন্ত্র বাস করিতে হইলে যে অর্থের দরকার, তাহাও ভ্রাতা না দিলে চলে না। নিত্যানন্দ ভগিনীর জন্য অতটা অপব্যয় করিতে রাজী ছিলেন না এক পরিবারে একত্র থাকিলে অল্প খরচে চলিয়া যাইবে, এই উদ্দেশ্যে নন্দনহাটীর বাসাতেই শোভারাণীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল।

অমলকুমার দেশে ফিরিয়াছে। সে বিলাত হইতে কোন পরীক্ষাই পাশ করিয়া আসিতে পারে নাই। কি করিয়া চলিবে, এই চিন্তাই তখন প্রবল হইল। নবগৌরাঙ্গ তাহাকে সম্পত্তির অবস্থা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। নিত্যানন্দের গ্রাস হইতে কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হইলেও, সে জন্য অর্থের প্রয়োজন। আপাততঃ

সে অর্থই বা কোথায়? গৌরী ভ্রাতাকে কোনও ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবার জন্য পরামর্শ দিল। কিন্তু যখন দেখিল যে মিঃ এ, রায় চৌধুরী কোনও স্ত্রীলোকের নিকট এ সম্বন্ধে উপদেশ লইতে অক্ষম—ভ্রাতাই সে কথা বুঝাইয়া দিল—তখন গৌরী আর ভ্রাতার সম্বন্ধে কোনও কর্ত্তব্য আছে বলিয়া বোধ করিল না।

তবে এ, রায় চৌধুরীর কতকগুলি গুণ ছিল। সে ছবি আঁকিতে পারে, ভাল ক্রিকেট, বিলিয়ার্ড খেলা শিখিয়া আসিয়াছে আর আট বৎসর বিলাতে থাকিয়া সাহেবী চালচলন ভাষা ভঙ্গি হুবহু আয়ত্ত করিয়াছে। তাহার ফলে অতি শীঘ্রই সে মহারাজ নবনগরের ক্রিকেটদলে প্রবেশ করিতে পারিল, এবং মহারাজের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়ায় সে রাজধানীতে রাজপারিষদরূপে স্থান পাইল।

কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশী দিন স্থায়ী হইল না। নবনগরের পারিষদবর্গ এই নূতন সাহেবের মেজাজ সহ্য করিতে পারিল না। সুতরাং শীঘ্রই রায় চৌধুরী সাহেব অন্য পন্থা দেখিতে বাধ্য হইলেন।

অমলকুমার কলিকাতায় আসিয়া কাজকর্ম্মের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গৌরীকে টাকার জন্য লিখিয়াও কোন ফল হইল না। নিত্যানন্দকে উকীলের চিঠি দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিতে গিয়া উত্তরে কড়া কথা শুনিতে হইল। বিলাতে সুদীর্ঘকাল অবস্থিতির ফলে অমলের অনেকগুলি বন্ধুলাভ ঘটিয়াছিল। তাহাদের

সঙ্গে একে একে সাক্ষাৎ করিয়া এক বেলা চা অথবা ডিনারের নিমন্ত্রণ ব্যতীত আর কোনও লাভ হইল না। কিন্তু সে লাভও কোনও কাজের নহে; কারণ বিলাতী প্রথা অনুসারে নিমন্ত্রণ খাইলে আবার খাওয়াইতে হয়। কলিকাতার মত স্থানে এক দিনও বসিয়া থাকিলে চলে না। অভাবের সহিত এরূপভাবে সংগ্রাম করিয়া অমলকুমার একদিন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িল এবং হোটেল হইতে বাধ্য হইয়া হাঁসপাতালে যাইতে হইল।

তিনমাস পরে হাঁসপাতাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অমলকুমার আশ্রয়ের চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিল। শরীর অবসন্ন, দুর্ব্বল; মন অশান্ত, উদ্বেগাকুল; পরিচ্ছদ মলিন এবং অর্থের একান্ত অভাব। এমন অবস্থায় পড়িলে লোক উন্মাদ হয় না? এই প্রশ্ন বারংবার অমলকুমারের মনে আসিতে লাগিল।

(৫)

নন্দনহাটীর সহরের উপান্তভাগে নিত্যানন্দের নূতন বাড়ীটি দূর হইতে ছবির মত দেখাইতেছিল। ঝাউ দেবদারু প্রভৃতির মধ্য দিয়া, যত্নে ছাঁটা মেদির বেড়া ঘেরা, দুইটি লাল সুরকীর রাস্তা বক্রভাবে বারান্দা পর্য্যন্ত গিয়া মিশিয়াছে। বড় রাস্তা হইতে সন্ধ্যার অন্ধকারেও সে বাড়ীর লাল পয়েন্টিং সিন্দুরে মেঘের মত দেখাইতেছিল।

একটি যুবক ধীর পদবিক্ষেপে সেই লাল সুরকীর রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। শার্টের উপর র‍্যাপারটি গলায় এমন ভাবে

জড়ানো রহিয়াছে যে ভাল করিয়া মুখ দেখা যায় না। যুবক প্রতি পদবিক্ষেপে যেন প্রত্যাশা করিতেছিল যে কাহারও সঙ্গে না কাহারও সঙ্গে হয়ত দেখা হইবে, কিন্তু বারান্দা পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াও কাহারও সাক্ষাৎ মিলিল না। তখন সে বারান্দার নিম্ন হইতে চাপা গলায় "বেয়ারা, বেয়ারা" বলিয়া বারকতক ডাকিল। বাহিরের ঘরে তখনও আলো দেওয়া হয় নাই।

বাড়ীর ভিতর হইতে একটি ছোট মেয়ে বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি চান?"

যুবক বলিল, "এটা নিত্যানন্দ বাবুর বাসা?"

বালিকা বলিল, "হ্যাঁ। আপনি কোথা হতে আসছেন?"

যুবক বলিল, "কলকাতা থেকে আসছি। নিত্যানন্দ বাবু বাড়ীতে আছেন কি?"

"না, তিনি এখনও কাছারী থেকে ফেরেন নি। আপনি বসুন।"

"তুমি নিত্যানন্দ বাবুর কে হও, মা লক্ষ্মী?"

"আমি তাঁর মেয়ে। আপনি উঠে এসে ঘরে বসুন।"

"হ্যাঁ বস্‌ব! তোমার পিসীমা কোথায়?"

"বড় পিসীমা? তিনি ভিতরে আছেন।"

যুবক বড় আগ্রহের সহিত বলিল, "তাঁকে একবার খবর দিতে পার, লক্ষ্মী।"

বালিকা এক ছুটে বাড়ীর ভিতর আসিল এবং শোভারাণীর

আঁচল ধরিয়া বলিল, "পিসিমা দেখ্‌বে এস, তোমায় কে ডাকচে বাইরে।"

শোভারাণী জিজ্ঞাসিলেন, "কে রে? কে ডাক্‌চে আমায়?"

"তোমায় ডাকচে, এস না, সে খুব ভাল।"

শোভারাণী একবার বাহিরের ঘরে উঁকি দিয়া দেখিলেন আলো নাই। একজন চাকরকে ডাকিয়া আলো দিতে বলিয়া তিনি কাপড় ছাড়িতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইলেন ও চাকরকে বলিলেন, "দেখ ত, কে বাবু এসেছেন, খুকী বলচে। কাকে চান?"

যুবক বারান্দায় উঠিয়াছেন; বৈঠকখানা উত্তমরূপে সজ্জিত। তক্তপোষের উপর ফরাস, ফরাসের উপর তিন চারিটা শুভ্র তাকিয়া। তক্তপোষের পাশে আলমারীতে সুন্দর বাঁধান পুস্তক-গুলির উপর সোনালী অক্ষর আলোকে চিকমিক করিতে-ছিল। আলমারীর ফাঁকে কয়েকখানি চেয়ার, ফরাসের উপরে টানা পাখায় বহুমূল্য ঝালর ও পাখার উপরে আলোর ঝাড়ের কলমগুলি বাতাসে ঠুনঠুন করিয়া শব্দ করিতেছিল। ঘরের পার্শ্বে একটি দরজা বাড়ীর ভিতরে যাইবার পথ এবং তাহাতে নীল বনাতের পর্দ্দা ঝুলানো রহিয়াছে। শোভারাণী সেই পর্দ্দার পাশে দাঁড়াইয়া চাকরকে বলিলেন, "দেখ ত ভর্ত্তু, বাহিরে কে?"

হিন্দুস্থানী চাকর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "একটি বাবু কলকাত্তা থেকে এসেছে।"

শোভারাণী চাকরটির বুদ্ধির দৌড় জানিতেন। তিনি আবার বলিয়া দিলেন, "ওঁর পরিচয় জেনে আয়।"

এইবার যুবক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আমার পরিচয়? মা, আমি যে তোমার ছেলে অমল।"

শোভারাণী পর্দ্দা সরাইয়া দেখিলেন, সেই রূপ, সেই মুখ, তেমনই কণ্ঠস্বর। এও কি সম্ভব? মনে হইল তাঁহার স্বামীরই মূর্ত্তি—যেন আরও অল্প বয়স্ক, আরও সুন্দর হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। র‍্যাপারটি তেমনি ভাবে গলায় জড়ানো, ছড়িখানি তেমনিভাবে বাঁকাইয়া ধরা তাহার উপরে "আমি তোমার ছেলে" এই একটি কথায় তাহার সমস্ত হৃদয়ের জননীভাব উথলিয়া উঠিল। যে বন্ধ্যা, তাহার সন্তানস্নেহ বুঝি আরও গভীর!

শোভারাণী পর্দ্দা ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং অমলকুমার প্রণাম করিবার পূর্ব্বেই তিনি তাহাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিলেন। গৌরী তাহাকে সেই বাল্যকালে লইয়া যাইবার পর যে বেদনা তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে এতদিন রুদ্ধ নিশ্বাসের মত ঘুরিয়া বেড়াইত, সেই বেদনা যেন জাহ্নবীর মত চোখের জলের ধারা বহাইল।

অমলকুমার এরূপ ঘটনার জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু মানুষের যে জন্মজন্মার্জ্জিত সংস্কার থাকে, তাহা সমস্ত সাহেবিয়ানার কঠোর আচরণের মধ্যেও কখনও লোপ পায় না। অমলকুমার —মা-হারা অমলকুমার—আজ মায়ের সন্ধান পাইয়া, আপনার অজ্ঞাতসারে সেই আট বছরের বালকে পরিণত হইল। মাঝের

কয়েকটি বৎসর এক নিমেষে যেন মুছিয়া গেল। সে-ও মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নিত্যানন্দ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, এই ব্যাপার। তাঁহার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি অমলকুমারের প্রত্যাগমন হইতে তাহার হাঁসপাতালে যাওয়া ও রোগমুক্তির বিষয় সমস্ত সংবাদই রাখিতেন। আজ হঠাৎ এ ব্যাপারের জন্য অবশ্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি পঞ্চম কণ্ঠে বলিলেন, "দিদি, এ সব ব্যাপার কি?"

শোভারাণী পুত্রকে একটু সরাইয়া দিয়া বলিল, "কই, কি ব্যাপার নিতাই? আমার ছেলে অমল; তুমি চিনতে পারনি?"

নিত্যানন্দ তেমনই রুক্ষ কণ্ঠে ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "আমি সে পরিচয়ে বাধিত হলেম। কিন্তু আমার এখানে ত যত ভবঘুরের আড্ডা নয়।"

শোভারাণী বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "ওঃ, আচ্ছা, তা আমি তোমার এখানে আড্ডা করতে চাইনে। আমি ছেলের সঙ্গে আজই চলে যাচ্ছি। তোমরা শান্তিতে থাক।"

নিত্যানন্দ বলিলেন, "বেশ তাই হোক। যেখানে ওর চাল চুলো থাকে সেখানে তোমায় নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু মনে রেখো দিদি, খেতে না পেয়ে, আবার এখানে আসতে হ'লে আমার দ্বার বন্ধ।"

এই কথা বলিয়া তিনি পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে কক্ষান্তরে গমন করিলেন। অমলকুমার কিছু বিমর্ষ হইল। নিজে গৃহহীন

—এখন মাকেও সে নিরাশ্রয় করিবে !

শোভারাণী বুঝিলেন। তিনি একটু কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "কোনও ভয় নেই, বাবা। ভগবান কাউকে পায়ে ঠেলেন না।"

অমলকুমার গাড়ী ডাকিয়া আনিল। উভয়ে বলরামপুর রওনা হইলেন। হরকান্ত বাবু শোভারাণীর নামে ব্যাঙ্কে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সে কথা শোভারাণী ব্যতীত দ্বিতীয় প্রাণীকে বলেন নাই। শোভারাণী ভ্রাতার ব্যবহারে সন্দিগ্ধ হইয়া, সে কথা চাপিয়া গিয়াছিল। বলরামপুরে আসিয়া সেই অর্থ হইতে কিছু আনাইয়া তাঁহারা সংসার চালাইতে লাগিলেন।

বিদেশী

সরকারী গেজেটে নৃসিংহচন্দ্র সিংহ আজমীড় মারওয়ার বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হইয়া বদলি হইলেন।

চক্রবেড়ে রোডের উপর নৃসিংহ বাবুর বাড়ী। নীচের বৈঠকখানা ঘরটি বেশ সাজানো গোছানো ছিল। কিন্তু আজমীড় যাত্রার উদ্যোগ-পর্ব্বে সে ঘরের শ্রী বদলাইয়া গেল। তাহার আসবাবপত্র ছবি ছত্রী সব অন্য ঘরে বাহিত হইল। আর বড় বড় ট্রাঙ্ক ও প্যাকিংকেসের রাশি ঘরের মেজেতে স্তূপীকৃত হইল।

বিকালের রোদ তখন পড়িয়া আসিয়াছে। বাহিরের ঘরটিতে অন্ধকার কেবল বাসা বাঁধিবার জোগাড় করিতেছিল। এমন সময় একটি যুবক অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। বাড়ীর ভিতরে কিছু কলরব থাকিলেও বাহিরের ঘরে জনমানবের সাড়া পাওয়া গেল না। এতগুলি লেবেলমারা বিছানা বাক্স সে ঘরে পড়িয়া রহিয়াছে, অথচ তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের কোনও ব্যবস্থাই নাই—আগন্তুক যুবক একটি প্যাকিং কেসের উপর বসিয়া ইহাই ভাবিতেছিল।

হঠাৎ নৃসিংহ বাবু এক তাড়া চাবি বাজাইতে বাজাইতে সেই ঘরে আসিলেন। যুবক যেমন বসিয়া ছিল, তেমনই

বসিয়া রহিল। ঈষৎ অন্ধকারের আবছায়ায় একটি অপরিচিত লোককে এমন নিশ্চিন্তভাবে প্যাকিং বাক্সের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নৃসিংহ বাবু একেবারে চটিয়া লাল হইলেন; বলিলেন—

"কেহে বাপু তুমি? তুমি এখানে বসে কি কচ্চ?"

যুবক একটু থতমত খাইয়া গেল। সে যে বসিয়া থাকিয়া কোনও অপরাধ করিয়াছে তাহা তার মনে হয় নাই। বাহিরের ঘরে কি লোক আসিতে মানা? তাহাকে নির্ব্বাক্ থাকিতে দেখিয়া নৃসিংহ বাবুর স্বর পঞ্চম ছাড়াইয়া উঠিল। তিনি স্বর ও মুখ বিকৃত করিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কে তুমি?"

এইবার যুবক ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমি বিদেশী।"

"বিদেশী, তা বুঝতে পাচ্ছি; তোমার নাম কি?"

"আজ্ঞে, আমার নাম—আমার নাম—আজ্ঞে বিদেশী।"

"তুমি এখানে কি কচ্ছিলে?"

"আজ্ঞে, এই বসে ছিলাম।"

"বেশ কচ্ছিলে।—বসে ছিলাম! কি কচ্ছিলে বল, নয়ত পাহারাওয়ালা ডাক্‌ব।"

"আজ্ঞে, পাহারা দিচ্ছিলাম।"

নৃসিংহ বাবু ব্যঙ্গের স্বরে 'পাহারা দিচ্ছিলাম', বলিয়া উচ্চস্বরে "পাঁড়ে পাঁড়ে" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। পাঁড়েজি শ্মশ্রুরাজির

গ্রন্থি পাকাইতে পাকাইতে আসিয়া হাজির হইল। তখন নৃসিংহবাবু তাহাকে তেমনই উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মদন কাঁহা গিয়া ? চাপ্‌রাশী ?"

পাঁড়ে একটি চক্ষু একটু উর্দ্ধে তুলিয়া বলিল—"তাইত বাবুজি, মদ্‌না ত হিঁ-ই রহা, তার পর কোথা চলিয়ে গেছে।"

এইবারে নৃসিংহ বাবুর স্বর নামিল, তিনি একটু ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "দেখো ত পাঁড়ে, ও কাপড়া আপড়া লেকে গিয়া কি নেহি ?" দেখা গেল, কাপড় চোপড় লইয়াই মদন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। নৃসিংহবাবু যেন আপন মনে বলিতে-ছিলেন, "যাঃ কাল বেটার মাইনে শোধ করে নিয়েছে কি না, আজ ভেগেছে। এই এখুনি আমার রওনা হতে হবে। এখন কোথায় লোক খুঁজি !" নৃসিংহ বাবু আগন্তুকের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তার পর বলিলেন, "কিহে বাপু, তুমি কি চাও ?"

"আজ্ঞে, চাকরীর জন্যে আপনার কাছে—"

"কি চাকরী তুমি করবে ? লেখাপড়া কতদুর করেছ ?"

"আজ্ঞে সে বড় বেশী দুর নয়। তবে আরদালী গিরি কাম করতে পারব বোধ করি।"

"সে কি ! তোমাকে ত ভদ্রলোকের ছেলে বলে বোধ হচ্চে, তুমি আরদালীর কাজ করবে কি ?"

"হুজুর, তাই জোটে কোথা ! ভদ্রলোকের ছেলের কি অন্ন আছে ?"

"তুমি আর কোথাও কাজ করেছ ?"

"আজ্ঞে হাঁ, মেটিয়ার কলেজে বনফোড় সাহেবের কাছে কিছুদিন কাজ করেছি।"

"আচ্ছা বেশ! আমার সঙ্গে আজমীড় যেতে রাজি আছ? আজ সন্ধ্যার পরেই যেতে হবে, পারবে ?"

"আজ্ঞে, না পারলে হবে কেন? আপনি যেকালে যাচ্ছেন—"

"মাইনে কত চাও ?

"আজ্ঞে মদন বার টাকা পেত, আমিও তাই চাই—"

"বেশ! মদনের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল বুঝি ?"

"আজ্ঞে সেই ত আমায় একটিনি দিয়ে চিজবস্তের হেফাজৎ করতে বলে গেল।"

"ওঃ"—বলিয়া নৃসিংহ বাবু অন্দরে চলিয়া গেলেন। পাঁড়েজি চোখের কোণে হাসির একটু মিঠা মীড় দিয়া, ঘনাইয়া আসিয়া বলিল, "তেরা নাম ক্যা রে, বাবা ?"

২

নৃসিংহ বাবুর পরিবার বেশী বড় নহে। আজমীড়ে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জন্য যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও একটি ছোটখাটো পরিবারেরই উপযোগী। তবে সাহেবী ধাঁজে ছোট বাংলোটি বেশ সাজানো। তারের বেড়া দিয়া ঘেরা কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটি বৃক্ষলতার নিবিড় কুঞ্জ, তারই মাঝখানে ছোট বাংলোটি। লাল পাথরে মোড়া বারান্দা হইতে একটি লাল

মাটির রাস্তা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বরাবর ফটকের বাহিরে আসিয়াছে এবং আনা সাগরের তীরে দুগ্ধফেন সদৃশ শ্বেত মর্ম্মরের যে দোলমঞ্চগুলি আছে, তাহার বেদিকা প্রান্ত চুম্বন করিয়াছে। নৃসিংহ বাবুর পূর্ব্বে যে সাহেব ঐ পদে ছিলেন, তাঁহারই কলানৈপুণ্য বাংলোখানির প্রতি অঙ্গে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

বাংলোটির একার্দ্ধ আফিস; অপরার্দ্ধ বাসভবন। আফিসের সম্মুখে একখানি টুলের উপর আরদালী বসিয়া থাকে। তাহার আকৃতি নাতিদীর্ঘ হইলেও সে তাহার পাগড়ীটি এমন উচ্চভাবে বাঁধিয়া লইয়াছিল যে, তাহাকে রাজপুতদের মতই লম্বা দেখাইত। তাহার সমস্ত মুখ বসন্তের দাগে এমন করিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছে যে, তাহার চেহারায় যে কোনও দিন কিছু কমনীয়তা ছিল, তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইত। তাহার শ্যামবর্ণ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, শরীর কৃশ হইয়াছে এবং মস্তকের কেশ বিরল ও পাঁশুটে হইয়াছে। মোটের উপর তাহাকে দেখিলে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের আরদালীগিরির যোগ্য বলিয়া মনে হইত না। সে বোধ হয় তাহা বুঝিত, সেই জন্য আরদালীর মত যাহাতে তাহাকে দেখায়, তাহার বিধিমত চেষ্টা করিত। আজমীড়ে পৌঁছিয়াই শুভ্র লংক্লথের ঘুন্টিদার চাপকান ফরমাইস দিয়া প্রস্তুত করাইয়া লইল, এবং সাহেবদের খানসামারা যেমন সাদা জড়ানো পাগড়ী পরে, সেইরূপ পাগড়ীও সংগ্রহ করিয়া লইল। পোষাক পরিয়া সে টুলের উপর সোজা হইয়া বসিত এবং

চাপরাশীর স্থলাভিষিক্ত বলিয়া আপনাকে যতদূর মানাইয়া লওয়া যায়, সে তাহার চেষ্টা করিত।

এ বিষয়ে পাঁড়েজি তাহার শিক্ষাদাতা ছিল। পাঁড়েজি অল্প আলাপেই বুঝিয়াছিল যে এ 'নয়া আদমী' তাহার সাগরেদ হওয়ার বাসনা রাখে। সে বহুদিন নৃসিংহ বাবুর নকরী করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা সে সযত্নে বিন্দু বিন্দু করিয়া ওজন পূর্ব্বক নবাগত চাকর ঝি ও চাপরাশীকে বাঁটিয়া দিত। মদন তাহার এই মুরব্বিয়ানার কিছু বিরোধী ছিল, সেই জন্য মদন চলিয়া যাওয়ায় পাঁড়েজির আনন্দই হইয়াছিল বেশী। বিদেশী সকল বিষয়ে ওস্তাদের মুখাপেক্ষী। তাহার কথা সে কোনও দিন ফেলে না; বরঞ্চ সে সাহেবের চাপরাশী হিসাবে যে সব বকশিশ পাইত, তাহার অনেক পরিমাণ পাঁড়েজির আফিম ও অন্যান্য সরঞ্জামে ব্যয় করিত। পাঁড়েজি প্রকাশ্য-ভাবেই বলিত যে "বিদেশী ভালমানুষের ছেলিয়া"। সাধু সন্ন্যাসী যেরূপ চেলাকে বাচ্চা বা বেটা বলিয়া সম্বোধন করেন, পাঁড়েজিও বিদেশীকে সেইরূপ কখনও বাচ্চা, কখনও বেটা বলিয়া আদরে ডাকিত। কোনও কাজ বিদেশীর পক্ষে কিছু শক্ত হইলে পাঁড়েজি নিজে কোমর বাঁধিয়া সেই কাজ করিয়া দিত, তাহাকে বলিয়া দিতে হইত না। জিজ্ঞাসা করিলে পাঁড়ে বলিত, "ও বাউরা হ্যায়। ওর মেজাজ আচ্ছা নেহি রয়তা।"

বিদেশীর যে একটু পাগলের ছিট আছে, তাহা নৃসিংহ বাবু কিম্বা তাঁহার কন্যারও মনে হইত, কারণ সে কখনও

হাসিয়া খেলিয়া মনের খুসীতে সব কাজ করিয়া যাইত ; আবার কখনও কখনও একেবারে গম্ভীর ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িত, তখন তাহাকে দিয়া কোনও কাজ করান প্রায় একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িত। নৃসিংহ বাবুর মাতা বলিতেন, "আহা থাক্, ওকে আর কষ্ট দিওনা। বাছা তোমাদের জন্যে রাত দিন খেটে খেটে পেরে ওঠে না।"

বিদেশীর রাত দিন খাটিয়া খাটিয়া পরিশ্রান্ত হইবার কোনও সম্ভাবনা না থাকিলেও, সে 'ঠাকুরমা'র কাছে নিতান্ত শ্রান্তক্লান্ত ভাবে গিয়া কখনও কখনও জুটিত এবং খাটুনীর দোহাই দিয়া তাঁহার স্নেহ করুণার ভাণ্ডার লুটিয়া লইত। সে তাঁহার আদর কিছু অতিমাত্রায় পাইয়াছিল অন্য কারণে ; তাঁহার বড় আদরের নাতি নাতিনী বিদেশীকে যে একেবারে পাইয়া বসিয়াছিল। মা-হারা শিশু দুইটি অবসর পাইলেই বিদেশীর নিকট ছুটিয়া আসিত এবং তাহাকে তাহাদের খেলার আসরে টানিয়া না আনিয়া ছাড়িত না। বৃদ্ধার স্নেহের দুলালেরা বিদেশীর সঙ্গ পাইয়া যেন এক অভিনব আনন্দ-রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছিল! অমিয়ার বয়স সাত বছর, প্রসূনের এগারো। গত বৎসর তাহাদের মাতা স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, শিশু দুইটি খেলার সময়েও যেন সেই হারানো স্নেহের সুবর্ণ রেখাটি মাঝে মাঝে দেখিতে পাইত এবং খেলার মাঝে হঠাৎ থামিয়া গিয়া গম্ভীর হইয়া পড়িত। নিদাঘের রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে যেমন কোনও অলক্ষিত মেঘখণ্ডের ছায়া ঘাসের উপর পড়িয়া সে

স্থানকে অকস্মাৎ মলিন করিয়া তুলে, তেমনই কোন্ অজ্ঞাত বিষাদের ছায়া এই লীলাচঞ্চল বালক বালিকার হৃদয় হঠাৎ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহা কেবল তাহারাই বলিতে পারে। তবে এ সকল তাহাদের বৃদ্ধ ঠাকুরমার চক্ষু এড়াইত না। সুতরাং বিদেশীকে পাইয়া যখন এই দুইটি বালক বালিকা খেলায় ভুলিল, তখন তিনি যেন কতই শান্তি পাইলেন।

সংসারের ভার এই বৃদ্ধার উপরেই ন্যস্ত থাকিলেও, গৃহিণী ছিলেন তাঁহার তরুণী নাতিনী—সুহাসিনী। সুহাসিনী ঠাকুরমার নিকট গৃহিণীপনার শিক্ষানবিশী করিয়া করিয়া, ষোড়শ-বর্ষে পাকা গৃহিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে শ্বশুরগৃহে কখনও যায় নাই, কি পিতৃগৃহের আরাম বিলাসও সে জীবনে বড় একটা উপভোগ করিতে পারে নাই। সুহাসিনীর মাতা, কন্যা যাহাতে সংসারের কাজে মন নিবিষ্ট করিয়া থাকিতে পারে, সে জন্য সর্ব্বদা তাহাকে কাজে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবার শিক্ষাই দিয়াছিলেন। আজ মা নাই, তাই সে কায়মনোবাক্যে সংসারের কাজের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। শারীরিক সৌন্দর্য্য বিষয়ে বিধাতা তাহার প্রতি কৃপণতা করেন নাই। যৌবনের পুলকস্পর্শে তাহার সমস্ত দেহ মন যখন সাড়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখনই তাহাতে বাধা পড়িল। পিতার সহিত শ্বশুরকুলের মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় সে স্বামী-সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছে। কাজেই যৌবনের নব নব ভাবোন্মেষে ভাবিত, রঞ্জিত হইবার অবকাশ সে পায় নাই।

তাহাকে দেখিলে কখনও বালিকা, কখনও তরুণী বলিয়া মনে হইত। সে যখন গৃহকর্ম্মে নিপুণা গৃহিণীর মত নিবিষ্ট থাকিত, তখন তাহাকে পাঁড়েজি পর্য্যন্ত ভয় করিয়া চলিত। কিন্তু যখন সে ভাই বোনের সঙ্গে খেলায় মাতিত, তখন তাহাকে দেখিলে মনে হইত যেন সে একেবারেই আত্মবিস্মৃতা বালিকা। বিদেশীকে লইয়া অমিয়া কিম্বা প্রসূন খেলিতেছে, এমন সময় সুহাসিনী যোগদান করিলে বিদেশী প্রথম প্রথম কিছু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত; কিন্তু সুহাসিনী তাহাকে নিষ্কৃতি দিত না। সে কাজের বাহানা করিয়া চলিয়া যাইতে চাহিলেও, ছোটরা তাহাকে জোরজবরদস্তি করিয়া টানিয়া লইত; তাহাতেও যখন সে রাজি হইত না, তখন সুহাসিনী তাহার উপর হুকুম চালাইত। 'মিস্ হুজুরে'র হুকুম বিদেশী তামিল না করিয়া পারিত না। খেলার আসরেও হুকুমের স্বরে সুহাসিনী বিদেশীকে বশ করিয়া ফেলিত। তখন বিদেশী চোখে বালি গিয়াছে কিম্বা পা মচকাইয়া গিয়াছে বলিয়া হঠাৎ পলাইয়া যাইত। বিদেশী পরের চাকরী করিতে আসিয়াছে, পাছে কেহ মন্দ দেখে এই জন্য সে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু পারিত না। সে খেলা হইতে ছুটি পাইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ছুটি লইত না। কারণ দিনের মধ্যে শত কার্য্যের ছল করিয়া সে "মিস্ হুজুরে"র ছায়াপথের পথিক হইত। সুহাসিনী যখন গৃহকর্ম্ম করিত, তখন নানা অছিলায় বিদেশী তাহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইত। অলক্ষ্যে তাহার কত ছোট ছোট কাজ সে করিয়া দিত। জিজ্ঞাসা করিলে, শুধু

হাসিত। বালিকা সুহাসিনী তাহার এই সেবাপরায়ণতায় আমোদ অনুভব করিত। যুবতী সুহাসিনী কথনও এজন্য নিজেকে এবং কথনও বা বিদেশীকে শাসন করিত।

অমিয়া প্রসূন নিবিষ্ট মনে বিদেশীর নিকট গল্প শুনিতে আসিত; সুহাসিনীরও ইচ্ছা হইত, সেও যোগদান করে; কিন্তু সম্ভ্রম আসিয়া বাধা জন্মাইত। সে মাঝে মাঝে এজন্য বিদেশীর উপর রাগ করিত—বিদেশী যেন তাহার ভাইবোনকে তাহার স্নেহবৃন্ত হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া যাইতেছে। সন্ধ্যার পর গৃহকর্ম্ম সারিয়া যথন সে আপনার শয়নগৃহে আসিত, তথন দেখিত অমিয়া প্রসূন বিদেশীর ঘরে গল্পে মত্ত হইয়া রহিয়াছে। খানিকক্ষণ একলা থাকিয়া সে বিরক্ত হইত। একদিন সে বিদেশীর ঘরের নিকটে আসিয়া ডাকিল, "চাপরাসী!"

"জি মিস্ হুজুর" বলিয়া বিদেশী বাহিরে আসিল। সুহাসিনী বলিল, "বিদেশী, তুমি আমায় মিস্ হুজুর বল কেন?"

"ওরে বাপ্‌রে! সাহেবও যেমন হুজুর, আপনিও তেমনই হুজুর। বড় সাপও সাপ, ছোট সাপও সাপ, হুজুর।"

"কিন্তু আমি ত মিস্ নই; তুমি আমায় মিস্ কেন বল্‌বে? আর মিস্ বল্‌তে পাবে না, আমি বলে দিচ্ছি।"

"জি, মিস্ হুজুর!"

"আবার বলে মিস্ হুজুর! আমার যে বে হয়েচে; যার বে হয়েছে, তাকে কি মিস্ বল্‌তে আছে না কি?"

"জি হুজুর, খোদাবন্দ, আমার সেটা জানা নেই।"

কানের দুল,

"না বাপু, ওসব খোদামন্দ ফন্দ এখানে চল্‌বে না।"

"জি মিস্‌ হুজুর।"

"আরে থেলে যা; বাবা এলে বলে দিয়ে তোমায় মজা দেখাচ্ছি, দাঁড়াও।"

"যে আজ্ঞে, গরীব পরবর; মালিক জনাব।"

সুহাসিনী বিরক্ত হইয়াও হাসিয়া ফেলিল।

পাঁড়েজি সাগরেদের হিন্দীর দৌড় দেখিয়া খুসী হইল। সে হাসিতে গুম্ফের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া বলিল, "ছুহাঁছ বোলো, ছুহাঁছ বোলো। নেই ত দিদি বাবু বোলো, আওর নেই ত মাই-জি বোলো।"

নৃসিংহ বাবু যখন সফরে বাহিরে হইতেন, তখন পাঁড়ে ও বিদেশী তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। বিদেশী অল্প দিনের চাকর হইলেও মনিবের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিল। তবে সে একটু খেয়ালী রকমের লোক ছিল বলিয়া পুরামাত্রায় তাহার উপর নির্ভর করা চলিত না। সংসারের কর্তৃত্ব এক বালিকার স্কন্ধে চাপাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। সুতরাং কাজের খাতিরে মফস্বলে যাইতে বাধ্য হইলেও, তিনি বাহিরে বেশী বিলম্ব করিতেন না, দুই এক দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিতেন।

কন্যার সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার অন্ত ছিল না। চারি বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি তখন উড়িষ্যা সার্কেলে কাজ করিতেন। বিবাহের সময় নিজে উপস্থিত থাকিতে পারেন

নাই। কুটুম্বেরা পাড়াগাঁয়ের লোক; সামান্য কারণে কন্যাপক্ষের সঙ্গে গোলমাল করিয়া বিবাহের রাত্রিতেই বর লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল। বরযাত্রীরা—বিশেষতঃ যাহারা বরের সমবয়স্ক—বিবাহ সভায় বড়ই দৌরাত্ম্য করিতেছিল; তারপর স্ত্রী-আচারের সময় যখন তাহারা ঠেলিয়া অন্দর মহলে যাইতে উদ্যত হইল, তখন তাহাদিগকে কেহ কেহ নাকি গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিল। সেই অভিমানে বিবাহের জলপান করা দূরে থাক, বরযাত্রীরা সেই রাত্রেই বর লইয়া পলায়ন করে। বাসর ঘর হইতে বর যে 'আসি' বলিয়া চলিয়া গেল, আর তাহার খোজ পাওয়া গেল না। ইহাতে প্রথম প্রথম কন্যাপক্ষ মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। কিন্তু বহুদিন গত হইলেও যখন বরপক্ষ কোনও খোঁজ লইলেন না, বা বধূকে লইয়া যাইবার কোনই প্রসঙ্গ দেখা গেল না, তখন কন্যাপক্ষ বিধিমত ভাবে সাধাসাধি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের মান ভাঙ্গিল না। নৃসিংহ বাবু বহু অর্থব্যয় করিয়া 'তত্ত্ব' পাঠাইলেন এবং জামাতাকে আনিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু বৈবাহিক জামাতাকে পাঠাইবার নামও করিলেন না, 'তত্ত্ব' ফেরত পাঠাইয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন—"কন্যাকে যেন নিজ ব্যয়ে রাখিয়া যায়।"

কয়েক মাস পূর্ব্বে বৈবাহিকটি গত হইয়াছেন; ছেলেটি মেডিকেল কলেজে পড়ে। কিন্তু তাহার মেজাজ ঠিক তাহার পিতারই অনুরূপ। সুহাসিনীর মাতা বাঁচিয়া থাকিতে, অনেক-বার তিনি তার মেসে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল

লাঞ্ছনাই তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল। নৃসিংহ বাবুর বিশ্বাস, কন্যার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়াই তাঁহার স্ত্রী অকালে মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার জামাতাকে একখানি মর্ম্মস্পর্শী পত্রও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার উত্তরে যখন সহানুভূতিসূচক একটি ছত্রও পাওয়া গেল না, তখন তিনি একেবারেই হতাশ হইলেন।

কিন্তু একদিন এই নিরানন্দের মধ্যেও তাহার অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি দেখা গেল। তিনি গেজেট খুলিয়া তাঁহার জামাতার এম-বি পাশের সংবাদ পাইলেন; দেখিলেন প্রায় সকল বিষয়েই সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিশেষ আনন্দের সংবাদ ছিল যে, সম্প্রতি দিল্লীতে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে ভারতীয় ভৈষজ্য কলেজ খুলিয়াছেন, তাহার অধ্যক্ষ ডাক্তার গডার্ট জোনাকিলালকে পাঁচ বৎসরের জন্য পাঁচশত টাকা বেতনে সহকারী নিযুক্ত করিয়াছেন। নৃসিংহ বাবু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মাতার সন্ধানে চলিলেন এবং মাতাকে এই সকল সংবাদ যখন জ্ঞাপন করিলেন, তখন বিদেশীর দুই হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে অমিয়া প্রসূন পর্য্যন্ত সেখানে গিয়া জড় হইল। তাহারাও পিতার সঙ্গে আনন্দ করিল; বৃদ্ধা কেবল একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন। সুহাসিনী কুটনো কুটিতে কুটিতে হাত কাটিয়া ফেলিল। সকল চক্ষুই তাহার মুখের উপর স্থাপিত হইয়াছিল। লজ্জায় তাহার মুখখানি রক্তিম হইয়া উঠিল এবং হাসা কাঁদার সন্ধিস্থলে তাহাকে যেন কেমন একরকম

দেখাইতেছিল। বিদেশী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিদেশীর ব্যবহার সুহাসিনীর নিকট অনেক সময় বড়ই অসঙ্গত বোধ হইত। যত দিন যাইতেছিল, ততই সে যেন আস্পর্দ্ধা পাইয়া কাছে ঘেঁসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুহাসিনীর ইহা মোটেই ভাল লাগিত না। সময়ে সময়ে সে বিদেশীকে একটু আধটু তিরস্কারও করিত; কিন্তু বিদেশী যেন এইরূপে সুহাসিনীকে বিরক্ত করিয়া আমোদ অনুভব করিত। এক দিন সে সন্ধ্যার পরে কয়েকটী জোনাকি ধরিয়া আনিয়া সুহাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিল—

"বলুন ত কি? যদি বলতে পারেন, হুজুর, ত আমার এ মাসের মাইনে আপনাকে দেব।" প্রসূন ও অমিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। সুহাসিনীর মুখ গম্ভীর হইল। বিদেশী জবাব না পাইয়া জোনাকীগুলি সুহাসিনীর গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিল। সুহাসিনী বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল এবং তার পর দুই তিন দিন তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না।

সুহাসিনীর হস্তে জল দিবার জন্য জলপাত্র ও তোয়'লে লইয়া অনাহূতভাবে বিদেশী বারান্দায় অপেক্ষা করে। জল ঢালিয়া দিবার সময় একদিন সে অন্যমনস্ক ভাবে সুহাসিনীর গায়ে জল ফেলিয়া দিল এবং তার পর তাহার রোষদীপ্ত চক্ষু দেখিয়া যদিও বিদেশী হাত জোড় করিয়া ক্ষমা চাহিল, তাহা হইলেও সুহাসিনী সেই অবধি আর কখনও বারান্দায় হাত ধুইতে আসিত না। এইরূপ

ছোটখাটো অনেক ঘটনায় বিদেশীর উপর সুহাসিনীর চিত্ত ক্রমে ক্রমে বিরূপ হইয়া উঠিতে লাগিল। সুহাসিনী খেলা ধুলা একে একে সকলই ছাড়িয়া দিয়া ক্রমে অসম্ভব রকম গম্ভীর হইয়া পড়িল।

কিন্তু সুহাসিনী বিদেশীর উপর বিরক্ত হইয়া থাকিতে পারিত না। ভদ্রগৃহস্থ সন্তান চাপরাশীর কার্য্য স্বীকার করিয়া আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া বহু দূরে আসিয়া তাহাদের আশ্রয়ে রহিয়াছে, একথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিত না। তাহার কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে বেশ বুঝা যাইত যে সে নিতান্ত পেটের দায়ে না হইলে এরূপ হীন ভাবে তাহাদের নিকট পড়িয়া থাকিত না। মাতৃশোকাতুরা বালিকা দুঃখীর দুঃখ ভাল করিয়াই বুঝিতে শিখিয়াছিল। তাহার আরও মনে হইত যে, তাহারই মত কোনও গভীর দুঃখের ছায়ায় বিদেশীর হৃদয়ও অন্ধকার করিয়া দিয়াছে।

বিদেশী মাঝে মাঝে আপন মনে গান করিত। একদিন সে কোথা হইতে একটি টিনের বাঁশী সংগ্রহ করিয়া আনিল। সুহাসিনীর খুব গানের সখ ছিল, সে নিজেও শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া গান শিক্ষা করিয়াছিল। গানের রস আস্বাদন করিবার শক্তিও সে কতকটা পাইয়াছিল। বিদেশীকে বাঁশী কিনিতে দেখিয়া সে বাঁশী শুনিবার জন্য বড়ই আগ্রহ করিতে লাগিল।

"এখন একবারটী বাঁশী বাজাও না, বিদেশী।"

"যে আজ্ঞে, হুজুর"—বলিয়া সে ঘর হইতে বাঁশী বাহির করিয়া আনিল এবং বসনাঞ্চলে ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া সেটি লইল। সে বারকতক প্রশংসনেত্রে বাঁশীর চাকচিক্য নিরীক্ষণ

করিয়া, আরও বারকতক সেটাকে কাপড়ে মুছিয়া লইল। তার পরে বলিল—

"কি বাজাব, হুজুর ?"

"যা খুসী একটা বাজাও।"

বিদেশী বার-কতক বাঁশীতে ফুঁ দিল, দিয়া বলিল, "আমি ত বাজাতে জানিনে ; আপনি বাজাবেন, হুজুর? এইখানে ধরে ফুঁ দিতে হয় ; এই দেখুন, হুজুর !" বলিয়া আরও জোরে বাঁশীতে সান দিল। সুহাসিনী ব্যাপার বুঝিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। আর সে বিদেশীকে কখনও বাঁশী বাজাইতে বলে নাই।

একদিন রাত্রে সে ঘুমাইয়াছে। অমিয়া প্রসূন তাহার দুই পার্শ্বে ঘুমাইয়া আছে, তখন সে যেন স্বপ্নে দেখিল, বিদেশী দূরে গিয়া বাঁশী বাজাইতেছে। জ্যোৎস্নার অলস মোহে তখন সমস্ত জলস্থল নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে। আর তাহার মাঝখান হইতে যেন একটি সুর উঠিতেছে—বড়ই করুণ, বড়ই কোমল। সে যেন এমন কোনও দিন শুনে নাই। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্য দিয়া জ্যোৎস্না যেন বাঁশীর সুরের রূপ ধরিয়া কি যে মোহ-প্রবাহ বহাইয়া দিল, তাহা সে অনুভব করিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার স্বপ্ন ছুটিয়া গেল বটে, কিন্তু সে জাগিয়া যে সুরটী শুনিল, তাহাও কম মিষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। গবাক্ষে দাঁড়াইয়া সে খানিক-ক্ষণ বাঁশী শুনিল। বিদেশীই যে বাঁশী বাজাইতেছে, সে সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। সে দরজা খুলিয়া বাহির হইল এবং বারান্দায় দাঁড়াইয়া বুঝিতে পারিল যে, বিদেশী ঘরের কপাট

জানালা বন্ধ করিয়া বাঁশী বাজাইতেছে; সেই জন্যই মনে হইতেছিল যেন বাঁশীর সুর অনেক দূর হইতে আসিতেছে। দূরত্বের জন্য বাঁশী আরও মিষ্ট শুনাইতেছিল।

সুহাসিনী ঘরে ফিরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল এবং যতক্ষণ বাঁশী বাজিল, ততক্ষণ অনন্যমনে তাহা শুনিতে লাগিল। তারপর সে যখন ঘুমাইয়া পড়িল, তখন তাহার উপাধান অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। পরদিন একটি কথা বারবার তাহার মনে হইতে লাগিল যে বিদেশীর মনে কোনও গভীর দুঃখ জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে; বিদেশী বড়ই গরীব, বড়ই দুঃখী। কিন্তু সে তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছিল বলিয়া, সুহাসিনী বাঁশীর সম্বন্ধে বিদেশীকে আর কোনও কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। তবে মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে যখন এমনই বাঁশী বাজিয়া উঠিত, তখন সে আপনাকে, স্থির রাখিতে পারিত না।

নৃসিংহ বাবু সফরে বাহির হইয়াছেন। এবারে ফিরিতে চার পাঁচদিন বিলম্ব হইবে বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মাতা সদ্য রোগ হইতে উঠিয়াছেন, তাঁহার কোনও কষ্ট না হয়, এজন্য পুনঃ পুনঃ সুহাসিনীকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ঠাকুরমার শুশ্রূষার ভার সুহাসিনীর উপরেই পড়িয়াছিল। কিন্তু কোন্ সূত্রে বিদেশী নিজস্কন্ধে যে সে ভারটি তুলিয়া লইল, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। বিদেশী এমনই পরিপাটী ভাবে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল যে, নৃসিংহ বাবু ও সুহাসিনী স্বেচ্ছায় তাহার উপর সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন,

সেও অক্লান্তভাবে সেবা করিয়া বৃদ্ধাকে সে যাত্রা বাঁচাইয়া তুলিল।

কিন্তু নৃসিংহ বাবু যাত্রা করিবার দুই একদিন পরেই সুহাসিনী রোগে পড়িল। তাহাকে দেখিবার মত সামর্থ্য বৃদ্ধার এখনও হয় নাই। সুতরাং বিদেশীই তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সে মাঝে মাঝে তাহাকে বাতাস করিতে যাইত; কিন্তু তাহাতে সুহাসিনী সোয়াস্তি বোধ করা দূরে থাক, অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিত। অথচ বিদেশী তাহার ঠাকুরমার যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছে, তাহাতে এত শীঘ্র তাহার সেবা প্রত্যাখ্যান করিলে নিতান্ত অকৃতজ্ঞতার কার্য্য হয়, এই জন্য সে বিরক্ত হইলেও সেকথা তাহার মুখের উপর বলিতে পারিত না।

একদিন তাহার অসুখ অত্যন্ত বাড়িল; সে জ্বরের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর হইতে মাঝে মাঝে সে জ্ঞান হারাইতে লাগিল। তাহার অসুখ যে বাড়িতেছে, সে তাহা নিজে বুঝিতে পারিল এবং পাঁড়েজিকে ডাকিয়া তাহার পিতাকে সংবাদ দিবার জন্য অবিলম্বে যাইতে বলিল। পাঁড়েজি রাত্রি ১২টার ট্রেণে চিতোরগড় অভিমুখে রওনা হইল এবং তাহার সাগ্‌রেদকে সাবধান করিয়া গেল যেন তাহার মুখ রক্ষা হয়। পাঁড়েজির দায়িত্বেই যে বিদেশীর চাকরী—একথা পাঁড়েজি সব সময়ে বিশেষ গৌরব করিয়াই বলিত।

কিন্তু পাঁড়েজি রওনা হইবার পর সুহাসিনীর জ্বর আরও বাড়িতে লাগিল। সুহাসিনী একটু তন্দ্রাভিভূত হইতেই

বিদেশী ছুটিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেল; এবং ডাক্তার যদিও তত রাত্রে পাওয়া গেল না, তাহা হইলেও সে একটি ডাক্তারখানায় গিয়া অনেক কষ্টে কিছু ঔষধ সংগ্রহ করিয়া আনিল।

সে ফিরিয়া আসিয়া যখন সুহাসিনীকে ঔষধ খাওয়াইয়া দিতে গেল, তখন সে চক্ষু মেলিয়া বিদেশীকে দেখিল, তার পর ত্রস্তভাবে ডাকিল—"বিদেশী।"

বিদেশী বলিল, "কোনও ভয় নেই, এই ওষুধটুকু খেলেই ঘুম হবে।"

"ওষুদ আমি খাব না, বিদেশী।"

"কেন খাবেন না? আমি যে কত কষ্ট করে এই দুপুর রাত্রে আপনার জন্য ওষুদ এনেছি—আর আপনি খাবেন না! তা হলে হুজুর কুঠীতে ফিরে আমায় কি বল্‌বেন?"

"আচ্ছা দাও, খাই। ওতে আমার কিছু হবে না।"

"কেন হবেনা? খেলেই ভাল হয়ে যাবেন, আমি বলছি। খুব ভাল ডাক্তারের ওষুধ, খেয়ে ফেলুন।"

সুহাসিনী বিদেশীর হাত হইতে ঔষধ লইয়া খাইল এবং বলিল, "বাঁচব না বোধ হয়। বাবাকে বোলো, আমার কোনও কষ্ট হচ্চে না। আর চাপরাশী,—তুমি তোমার ঘরে গিয়ে ঘুমাও, নইলে তোমার কষ্ট হবে।"

"যে আজ্ঞে, হুজুর"—বলিয়া বিদেশী বাহিরে যাইবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সুহাসিনী আবার ডাকিল, "বিদেশী, ভাই, তুমি বারান্দায় ঘুমাও। নয়ত আমার ভয় করবে।"

বিদেশী হাসিয়া বলিল, "ভয় কি? আমি কাছেই আছি। দুঘণ্টা বাদে আবার ওষুধ দিতে হবে যে।"

বিদেশী হাসিয়া বলিল বটে, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর যেন ভারী হইয়া উঠিল। সুহাসিনী তাহা বুঝিতে পারিল; রোগের সময় সহানুভূতি কখনও কখনও তীক্ষ্ণ হয়।

সে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আর জন্মে তুমি আমাদের কেউ ছিলে কি না জানি নে; কিন্তু তোমাকে যেন চিরপরিচিত আত্মীয় বলে মনে হয়। ভগবান তোমার ভাল করবেন।"

সুহাসিনী পাশ ফিরিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল; বিদেশী তাহারই শিয়রে বসিয়া রহিল। আজ এই দুর্দিনে বিছানায় বসিতে সে সংকোচ বোধ করিল না।

রাত্রি যখন আড়াইটা কি তিনটা, তখন একবার ঔষধ দিয়া বিদেশী তাহার ক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। শেষ রাত্রে যখন দেখিল ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং রোগিণী ক্রমশ সুস্থ বোধ করিতেছেন, তখন সে ঘুমে ঢুলিতে লাগিল। তার পর কখন যে সে শয্যার এক প্রান্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বেচারী জানিতে পারে নাই।

ভোর হইতেই সুহাসিনী চক্ষু মেলিল। বিদেশীকে তাহারই শয্যার প্রান্তে দেখিয়া সে যেন লজ্জায় মরিয়া গেল।

সে প্রসূনকে ধাক্কা দিয়া তুলিয়া দিল এবং বিদেশীকে জাগাইয়া দিতে বলিল। বিদেশী হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া রোগিণীর দিকে অর্দ্ধ উন্মীলিত নয়নে চাহিয়া দেখিল এবং তন্দ্রাবিজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছ ?"

পরক্ষণেই সে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিল এবং পুনঃ পুনঃ সেলাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যার ট্রেণে নৃসিংহ বাবু ফিরিলেন, তখন সুহাসিনী অনেকটা ভাল ছিল। ঔষধ রীতিমত দেওয়া হইতেছিল। দুই চার দিনের মধ্যেই সে অনেকটা সামলাইয়া উঠিল। তাঁহার মাতাও আজকাল একটু একটু করিয়া সংসারের কাজে হাত দিতে পারিতেছেন। এক দিন রাত্রে যখন সকলে শয়ন করিয়াছেন, তখন নৃসিংহ বাবু বারান্দায় পায়চারী করিতে করিতে বিদেশীকে ডাকিলেন। বিদেশী তখন ঠাকুরমার নিকট হইতে একখানি দাশুরায়ের পাঁচালী চাহিয়া লইয়া মনোযোগ সহকারে তাহা পাঠ করিতেছিল।

নৃসিংহ বাবু বলিলেন, "বিদেশী, আমার কাছে তুমি বেশী দিন কাজ করনি বটে, কিন্তু এরই মধ্যে তোমার কাজে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলাম।—কিন্তু তোমায় ছেড়ে দিতে হচ্চে আমাকে। এবার মফঃস্বল থেকে এসে দেখলাম, সুহাস তোমার ব্যবহারে ততটা খুসী নয়! তুমি যে তার সেবাশুশ্রূষা করেছ, এজন্য সে তোমার নিকট খুব কৃতজ্ঞ। অথচ কিসে যে চটে গেল, সেটা আমি বুঝতে পারিনে। এ দিকে তোমার সুখ্যাতি কচ্চে

খুব, কিন্তু আবার জেদ ধরেচে যে কিছুতেই তোমাকে রাখা হবে না। মেয়েদের মনের গতি বোঝা ভার। আমি, বাবা, তোমার হিসেব করে রেখেচি, কাল সকালে তুমি অন্যত্র যেতে পার।"

বিদেশী খুব যে দুঃখিত হইল, তাহা বোধ হইল না। সে নৃসিংহ বাবুর স্বাভাবিক সরলতায় মুগ্ধ হইয়াছিল। আজ সে চাকরীতে জবাব পাইয়া প্রথা মতই বলিল, "যে আজ্ঞে, হুজুর।"

পরদিন প্রাতে আর তাহাকে দেখা গেল না। পাঁড়েজি সমস্ত দিন হায় হায় করিয়া কাটাইল। সেদিন অমিয়া প্রসূন বা সুহাসিনী কাহারও মুখে হাসি ছিল না।

ইহার পর দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। একজনের স্থলে তিনজনকে রাখিয়াও কাজের তেমন সুবন্দোবস্ত আর হইল না। নৃসিংহ বাবুর ছেলে মেয়েরা বিদেশীকে যেমন করিয়া পাইয়া বসিয়াছিল, তেমন করিয়া আর কাহারও সঙ্গে মিশিল না। নৃসিংহ বাবু তাহাদের জন্য সকালে বিকালে মাষ্টারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

এমনি ভাবে নিয়মের লৌহবর্ম্মে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসার একরূপ চলিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় তিনি একখানি টেলিগ্রাম পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও বিচলিত হইলেন। তাঁহার জামাতা দিল্লী হইতে টেলিগ্রাম করিতেছেন যে তিনি কিছুদিন হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছেন; সত্বর তাঁহার স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়।

নৃসিংহ বাবু জামাতার অসুখের কথা ভুলিয়া গেলেন। তাহার কন্যাকে যে লইতে চাহিয়াছে, ইহাতেই তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার মাতাও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অমিয়া প্রসূনও সুতরাং যাইবে।

পরদিন প্রাতে জামাতার মাতুল সরসীলাল, ইঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য আসিলেন। বধূবর্জ্জনে ইঁহারই হাত ছিল কিছু বেশী। কিন্তু সময়ের গতিকে ইঁহাকেই দূত সাজিয়া আসিতে হইল। নৃসিংহবাবু ইঁহাকে একবার বৈবাহিক বলিয়া সাদর আহ্বান করিলে, ইনি তাঁহাকে কটু কথা শুনাইয়া দিতেও ত্রুটি করেন নাই। আজ তিনিই আসিয়া মস্তক অবনত করিয়া প্রথা অভিবাদন করিলেন। কিন্তু সে সময়ে যে তিনি আপনার ভাগিনেয়কে ঠিক আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন, এমন বোধ হইল না। যাহা হউক, সেই দিনই একজন চাপরাশীকে সঙ্গে দিয়া নৃসিংহবাবু সকলকে পাঠাইয়া দিলেন এবং বৈবাহিককে বলিলেন যে, তিনি ছুটীর আবেদন করিয়া উপরে টেলিগ্রাম করিয়াছেন, তাহার জবাব আসিলেই তিনিও দিল্লীতে রওনা হইবেন।

সুহাসিনী ঠাকুরমাকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে পৌছিল। জোনাকীলালের বাসা চৌকের ধারে দেলখোস বাগীচার নিকটে ছিল। বাসাটি ক্ষুদ্র হইলেও বাগীচার জন্য বেশ খটখটে ও ঝকঝকে দেখাইত। একটি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ আসিয়া ষ্টেশন হইতে সুহাসিনীদের লইয়া গেল। সুহাসিনী সারাপথ কৌতূহল ও আশঙ্কার বেদনা ভরা আবেগ বহিয়া লইয়া চলিল। মিশির

ঠাকুরের মুখে যদিও সে সংবাদ পাইল যে ডাক্তার সাহেব কিছু ভাল আছেন, তথাপি তাহার এই প্রথম স্বামিসম্ভাষণ যাত্রায় হৃদয় বড়ই অশান্তভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার মন অনেকটা আশ্বস্ত হইল, একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায়। সে বাড়ীতে ঢুকিতেই দেখিতে পাইল, টুলের উপর একখানি শ্লেট ও পেন্‌সিল লইয়া বিদেশী বসিয়া আছে। তাহার মাথায় তেমনই শুভ্র পাগড়ী শোভা পাইতেছিল। সে আশ্চর্য্যান্বিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সকলকে সেলাম করিল। অমিয়া ও প্রসূন ছুটিয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। ঠাকুরমা বলিলেন, "তুমি এখানে এসেছ বিদেশী; তা বেশ, এমন করে না বলে কয়ে চলে আস্‌তে আছে?"

সুহাসিনী অধরকোণে একটু হাসির আভাস দিয়া অন্দরের দিকে চলিল। তাহার হৃদয় আর একটি প্রত্যাশিত ঘটনার জন্য বড় দুরুদুরু করিতেছিল। মিশির জিনিষপত্র টানিয়া ঘরের মধ্যে গুছাইয়া রাখিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল—সুহাসিনীর চক্ষু প্রতি কক্ষে কাহার সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। বিদেশী বলিল, "ডাক্তার সাহেব ডাক্তারখানায় গেছেন, এখনই আসবেন। মিশর্‌পতিয়া গোছলখানামে পাণি দে।"

কিছুক্ষণ বাদে জোনাকীলাল সাহেবী পোষাকে একখানি ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন, এবং অতি কষ্টে গড় হইয়া ঠাকুরমাকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর মা বলিলেন, "কে বিদেশী?"

জোনাকীলাল সংশোধন করিয়া কহিল, "না ঠাকুরমা, আমি শ্রীমান জোনাকীলাল রায়; আপনার নাতজামাই।"

অমিয়া ও প্রসূন একটু সরিয়া গেল; তাহারা ভাল করিয়া ঘটনাটি বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহারা তাহাদের বিদেশীকেই চেনে, এ নূতন বিদেশীকে তাহারা তাহাদের অন্তরের কোণে বসাইতে পারিতেছিল না। ডাক্তার ঝাঁ করিয়া অমিয়াকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "আমি সেই বিদেশী রে পাগলী, আবার তেমনই করে ছুটোছুটি করে খেল্‌ব। কেমন, দিদি?"

এইবার ঠাকুরমা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন ও জোনাকীলালের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সুহাসিনীর ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "ওমা আমার কি হবে গো! ও সুহাস, ওরে দেখ, আমাদের বিদেশী, আমাদের চাপরাশী, আমাদের বেয়ারা। ও মা কি হবে!"

জোনাকীলাল ঠাকুরমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া কীর্ত্তনের সুরে গান ধরিয়া দিল—

আমি তোমারই কারণে নন্দেরই ভবনে
বাধা রয়েছিনু রাই।

পরদিন নৃসিংহ বাবুর নিকট টেলিগ্রাম গেল "জোনাকী বেশ আছে; তাড়াতাড়ি ছুটি লইয়া আসিবার প্রয়োজন নাই।"

পরলোকগত

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায় এম্‌-এ প্রণীত

সাবিত্রী

একখানি মনোজ্ঞ উপন্যাস। ৺সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনেক মনস্বী ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রশংসিত। সতীশ বাবু কৃষ্ণনগর ও কটক কলেজে অধ্যাপকতা কালে অনেক বন্ধু ও ছাত্রের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেককেই পরলোকগত বন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এক এক খণ্ড পুস্তক গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তকখানির ভাব ও ভাষা মর্ম্মস্পর্শী। সকলেই ইহা পাঠ করিয়া প্রীত হইবেন। স্বর্ণাঙ্কিত রেশমী বাঁধাই।

মূল্য এক টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা